শিল্পী : কনকচাঁপা চাকমা

২৭
প্রথম আলো
বিশেষ ক্রোড়পত্র
বুধবার, ৫ নভেম্বর ২০২৫, ২০ কার্তিক ১৪৩২
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
২০২৫

Daily ePapers
BD
Click here to join the channel

বৈষম্যের অন্দরে

সমাজ আর জনগোষ্ঠীর গভীরে থেকে যাওয়া বৈষম্য প্রতিফলিত হয় রাষ্ট্রে। আবার রাষ্ট্রীয় বৈষম্য সামাজিক বৈষম্যকে ভিত্তি দেয়। দেশের নারী-লেখক ও ভাবুকেরা উন্মোচন করে দেখিয়েছেন সমাজে ছড়িয়ে থাকা নানা বৈষম্যের চেহারা।

বাংলাদেশে নারীর রাজনীতি, রাজনীতির নারী

সামিনা লুৎফা
অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

> যুগ যুগ ধরে নারীরা যে অত্যাচার-অবহেলা সয়ে এসেছে খেলার পুতুল হয়ে, তাকে দূর করতে কেবল দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখেই নয়—এর প্রতিকার হবে বিদ্রোহে।
>
> সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে সুফিয়া কামালের চিঠি, ২৩ জুলাই ১৯২৯ [জানানা মহফিল, ১৯৯৮]

বাংলাদেশে নারীর জন্য বিদ্রোহের উত্তপ্ত প্রান্তরের একটা হলো রাজপথের লড়াই। যে লড়াইয়ের পথরেখা পিতৃতান্ত্রিকতার আঘাতে রক্তে ভেজা। প্রীতিলতা, বেগম রোকেয়া, শামসুন্নাহার, লীলা নাগ, নুরুন্নাহার খাতুন, সুফিয়া কামালসহ আরও অনেক নারীর রক্তে রঞ্জিত সেই লহুরেখা। তাঁদের রেখে যাওয়া পথে একুশ শতকের অন্যতম বড় রাজনৈতিক ঘটনায় নারীর নেতৃত্বপূর্ণ লড়াইয়ে জয়ের পর আমাদের সমতার আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ কতটা ঘটল? নাকি নারীর জান ও জবানের অধিকার চরায় আটকে গেল? এসব নিয়ে আলাপ অত্যন্ত জরুরি।

স্বাধীনতার পরের পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নেই বললেই চলে। রাজনৈতিক দলে ও সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিকভাবে নারী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আসনপদ্ধতি চালু করা হয়েছিল, কিন্তু সে পদ্ধতির ফলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটেনি।

তাহলে প্রশ্ন জাগে, যে ব্যবস্থা প্রকৃত ক্ষমতায়ন ঘটায় না, দশকের পর দশক সেটা টেনে নেওয়ার যৌক্তিকতা কী? ধারণা করি, সংসদে আসন-জেতা রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য একধরনের পুরস্কার আর নারীর জন্য আলংকারিক উপস্থিতি নানাভাবে সুবিধাজনক বলেই এই ব্যবস্থা লজ্জাজনক হলেও টিকে গেছে। তবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান যেহেতু নানা পরিবর্তনের অভূতপূর্ব সুযোগ নিয়ে এসেছিল বলে মনে হয়েছিল, তাই গত এক বছর নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

নারীরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন কেন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় আমরা নারীদের অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখেছি। কেবল প্রতীকী অংশগ্রহণকারী বা সংখ্যাসূচক ব্যক্তিত্ব হিসেবে নয়, বরং সক্রিয় এজেন্ট ও নেতা হিসেবেও। নারীরা সাহসের সঙ্গে সামনের সারিতে দাঁড়িয়েছিলেন। গণ-অভ্যুত্থানের প্রাথমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল কৌশলগত; হত্যাকাণ্ডের পরে নারীরা প্রকৃত নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা সংগঠিত হয়েছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, রাস্তায় দৃশ্যমান ছিলেন এবং অসাধারণ সাহস দেখিয়েছিলেন। তাঁরা মা, গৃহিণী, ছাত্রী বা পেশাজীবী যা-ই হোন না কেন, প্রতিবাদকারী ছাত্রীদের রক্ষা করার জন্য সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং মাঠে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এই কারণে দৃঢ় প্রত্যাশা ছিল যে জুলাই-পরবর্তী রাজনৈতিক সংস্কারের আলোচনায় ও নীতি নির্ধারণে নারীদের দৃশ্যমান ও কেন্দ্রীয় ভূমিকা থাকবে। দুর্ভাগ্যবশত, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সময় উপদেষ্টা পরিষদে নারীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। তিনজন ছাত্র উপদেষ্টার মধ্যে কেউই নারী ছিলেন না। অনেকেই এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে নারীদের ইচ্ছাকৃতভাবে প্রান্তিক করা হচ্ছে। চব্বিশের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে জয়ী নেতারা রাজু ভাস্কর্যে দাঁড়িয়ে যখন পরবর্তী পদক্ষেপ ঘোষণা করছিলেন, সে সময়ের ছবিতে দেখা যায়, মঞ্চে একজন ছাড়া প্রায় সবাই পুরুষ। কয়েক সপ্তাহ ধরে সংবাদমাধ্যমে নারী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বেশ লক্ষণীয় ছিল, কিন্তু সেদিনের ছবিতে দেখা যায় তাঁরা বসে আছেন নিচের সিঁড়িতে, প্রায় অদৃশ্য। অর্থাৎ ৫ আগস্ট থেকেই নারীদের প্রান্তিক করে ফেলা হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে আমরা নারীদের চলাচল সীমিত করার অপচেষ্টা, পথে-ঘাটে শারীরিক হেনস্তা ও সাইবারস্পেসে ব্যাপক হয়রানি দেখেছি। অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা, সেমিনার ইত্যাদিতে দেখেছি প্রায় সব বক্তাই পুরুষ। ফলে এমন ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে নারীদের ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এমন প্রশ্ন জোরেশোরে উচ্চারিত হয়েছে : নারীরা কোথায় গেলেন? গণ-অভ্যুত্থানে যে নারীরা সামনের সারিতে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন কেন?

এই অন্তর্ধানের পেছনে সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় কারণই রয়েছে। বাংলাদেশে রাজনীতি কখনোই নারীদের জন্য নিরাপদ বা স্বস্তিকর ছিল না। অর্থ ও পেশিশক্তিনির্ভর আমাদের রাজনীতি পুরুষালি দাপট আর 'ব্যাটাগিরি' দেখানোর জায়গা, যেখানে নারীদের প্রায়ই সুবিধাবঞ্চিত মনে করা হয়। এই ধারণার কিছু ভিত্তি রয়েছে : নারীদের এখনো সম্পত্তি ও সম্পদের সমান অধিকার নেই। এমনকি ধর্মীয় অনুশাসন নারীদের যে অধিকার দেয়, তা-ও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় না। উপার্জনশীল নারীদের উপার্জিত অর্থ কীভাবে ব্যয় করা হবে, সেই নিয়ন্ত্রণও প্রায়ই তাঁদের নিজেদের হাতে থাকে না। সন্তানের শিক্ষা, বিয়ে ও অন্য বড় পারিবারিক সিদ্ধান্তগুলো পুরুষেরাই নেন।

সমাজে নারীর অবস্থা যখন এই, তখন তাঁদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন। রাজনীতি প্রায়ই সংঘাতপূর্ণ হয়; সহিংস পরিস্থিতিতে নারীদের নিরুৎসাহিত করা হয়। সংঘাত নিরসনে তাঁদের ভূমিকা রাখার প্রস্তুতি ও দক্ষতা থাকলেও তাঁরা তা করতে পারেন না, কারণ তাঁদেরকে মনে করা হয় দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক।

পরিবার, রাষ্ট্র, এমনকি সহকর্মীরাও প্রায়ই রাজনৈতিক আলোচনার টেবিলে নারীদের স্থান দেওয়ার বিরোধিতা করেন। ঐকমত্য কমিশনের সভাগুলোতে নারীদের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে আমাদের রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নারী সহকর্মীদের নিয়ে আসেনি। তাঁরা এর পেছনে যে অজুহাতই দাঁড় করান না কেন, বাংলাদেশের নারীরা এ বৈষম্য মনে রাখবেন এবং এর জবাব ভোটের মাঠে নিশ্চয়ই চুকিয়ে দেবেন।

যে নারীরা একই সঙ্গে ঘরে ও অফিসে কাজ করেন, তাঁরা ইতিমধ্যে দ্বিগুণ বোঝা বহন করেন। তার ওপর যখন কেউ অ্যাকটিভিজম ও রাজনীতিতে জড়িত হন, তখন তাঁর বোঝা হয় তিন গুণ। কারণ, গৃহস্থালির দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের কাছ থেকে নারীরা খুব কম সহযোগিতা পান। যেহেতু রাজনীতি পূর্ণকালীন প্রতিশ্রুতি দাবি করে, তাই অনেক নারী যোগ দিতে দ্বিধা করেন। দক্ষতার অভাবে নয়, বরং এই সামাজিক বাস্তবতার কারণে।

> সমাজ যদি পূর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত না হয়, তাহলে সংরক্ষিত আসনগুলো অস্থায়ীভাবে অব্যাহত থাকতে পারে, কিন্তু তা করতে হবে ভোটের মাধ্যমে।

নারী বিষয়ে কমিশন

এই কাঠামোগত বাধা সত্ত্বেও জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের ফলে তৈরি হওয়া নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মগুলো এবং অন্তর্বর্তী সরকার নারীদের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করার সুযোগ তৈরি করবে, এমন আশা ছিল। অথচ সরকার নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠনে দেরি করেছে এবং সেই কমিশনের প্রতিবেদনটি নিয়ে কমিশনের সদস্যরা যখন হয়রানি ও হুমকির মুখে পড়েছেন, তখন সরকার তার নিজ কমিশনের সদস্যদের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে। ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় ওই প্রতিবেদনের পরামর্শগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এর ফলে নারীরা প্রতারিত বোধ করেছেন, বুঝেছেন যে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো তাঁদের উদ্বেগকে গুরুত্ব দিচ্ছে না।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় আমরা নারীদের সক্রিয় এজেন্ট ও নেতা হিসেবে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখেছি। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

তবু সংস্কারপ্রক্রিয়ার ওপর আস্থা রেখে, সংবিধান ও নির্বাচন কমিশনবিষয়ক সংস্কার প্রস্তাব অনুসরণ করে সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ ছিল। আমরা আশা করেছিলাম, কয়েক দশক ধরে সংরক্ষিত আসন প্রকৃত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ার পর এবার অন্তত সরাসরি নির্বাচনের দিকে মনোযোগ স্থানান্তরিত হবে।

সরাসরি বনাম সংরক্ষিত

সমাজ যদি এখনো পূর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত না হয়, তাহলে সংরক্ষিত আসনগুলো অস্থায়ীভাবে অব্যাহত থাকতে পারে, কিন্তু তা করতে হবে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে। নারী আন্দোলনের দাবি ছিল, রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ আসনের জন্য মনোনীত নারী প্রার্থীর হার বৃদ্ধি করবে। জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুসারে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কমিটিগুলোতে ৩০ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার কথা। কিন্তু তা পূরণ করতে দলগুলো বারবার ব্যর্থ হয়েছে।

রাজনীতিতে নারীদের জন্য আরেকটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় হলো নির্বাচনী খরচ। অর্থের ভূমিকা বিবেচনা করে ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে সরকারের জেন্ডার বাজেট কাঠামোর অংশ হিসেবে সব নারী প্রার্থীর প্রচারের ব্যয় বহন করা উচিত।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার হতাশাজনক ফল হচ্ছে, নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ মনোনয়ন বিষয়ে অনীহা। সংরক্ষিত আসনগুলো রয়ে গেছে, কিন্তু সরাসরি নির্বাচনের কোনো পদক্ষেপ ছাড়াই জুলাই সনদ স্বাক্ষর করা হয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের বাধ্যবাধকতা রেখে। জুলাই সনদের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ৩০টির বেশি রাজনৈতিক দলের অনেকগুলোরই প্রকৃত জনসমর্থন প্রায় নেই, তারপরও আলোচনায় তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, অথচ জনসংখ্যার অর্ধেকের প্রতিনিধিত্ব সেখানে ছিল না।

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস এবং গণ-অভ্যুত্থানে অনন্য সাহসী ভূমিকা সত্ত্বেও আলোচনা প্রক্রিয়া থেকে নারীদের সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া কেবল আয়োজকদের ব্যর্থতাই নয়, সরকার এবং মানবাধিকার ও নারী অধিকারের চ্যাম্পিয়ন এনজিও নেতাদের জন্যও লজ্জাজনক।

একটি অনন্য সুযোগ সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো হারিয়েছে। ঐকমত্য গঠনের প্রক্রিয়াটি নারী, শ্রমিক, কৃষিজীবী, আদিবাসী, লিঙ্গবৈচিত্র্যপূর্ণ সম্প্রদায় এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীকে নিয়ে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে পারত। জুলাই সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ায় আমরা সেই সুযোগ হারিয়েছি। নামমাত্র ৫ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব এবং নারী-কৃষক-শ্রমজীবী সাধারণ মানুষদের অধিকার বা অংশগ্রহণ সম্পর্কে উল্লেখহীন এ সনদ কয়েকটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর 'এলিট বয়েজ ক্লাবের' সনদে পর্যবসিত হয়েছে, যা কিনা দেশকে 'বর্বরতা থেকে সভ্যতা'য় নিয়ে আসার দাবি করে। এই দাবি ও এই সনদকে তাই প্রান্তিক জনগণ প্রত্যাখ্যান করে।

নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম তাঁর হয়ে কেউ করে দেবে না, তার প্রয়োজনও নেই। এ লড়াই নারীদেরই এগিয়ে নিতে হবে। এ লড়াইয়ের পথ দীর্ঘ। নারীরা এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন—আগামী দিনগুলোতে আরও দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার প্রস্তুতি।

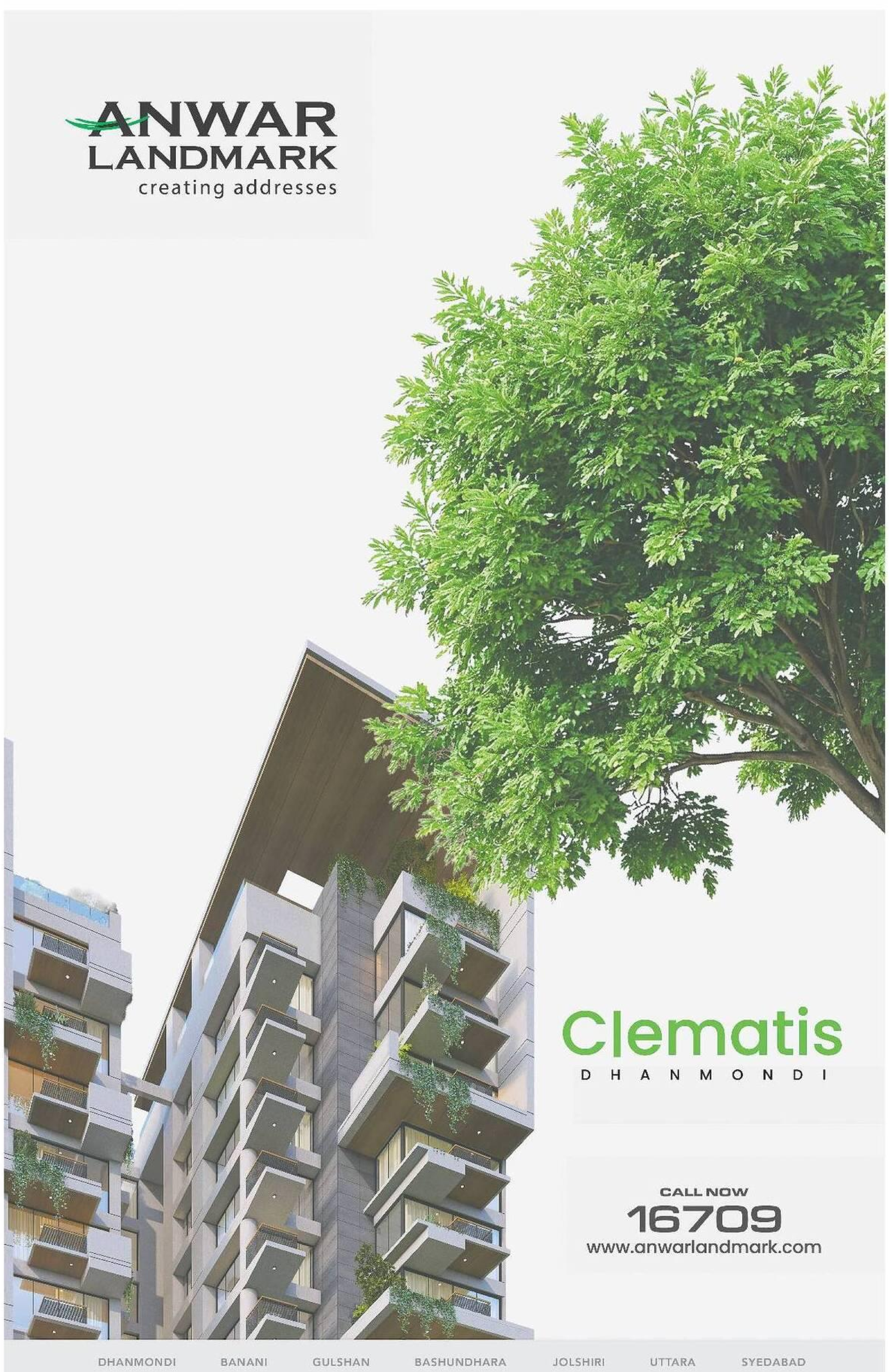

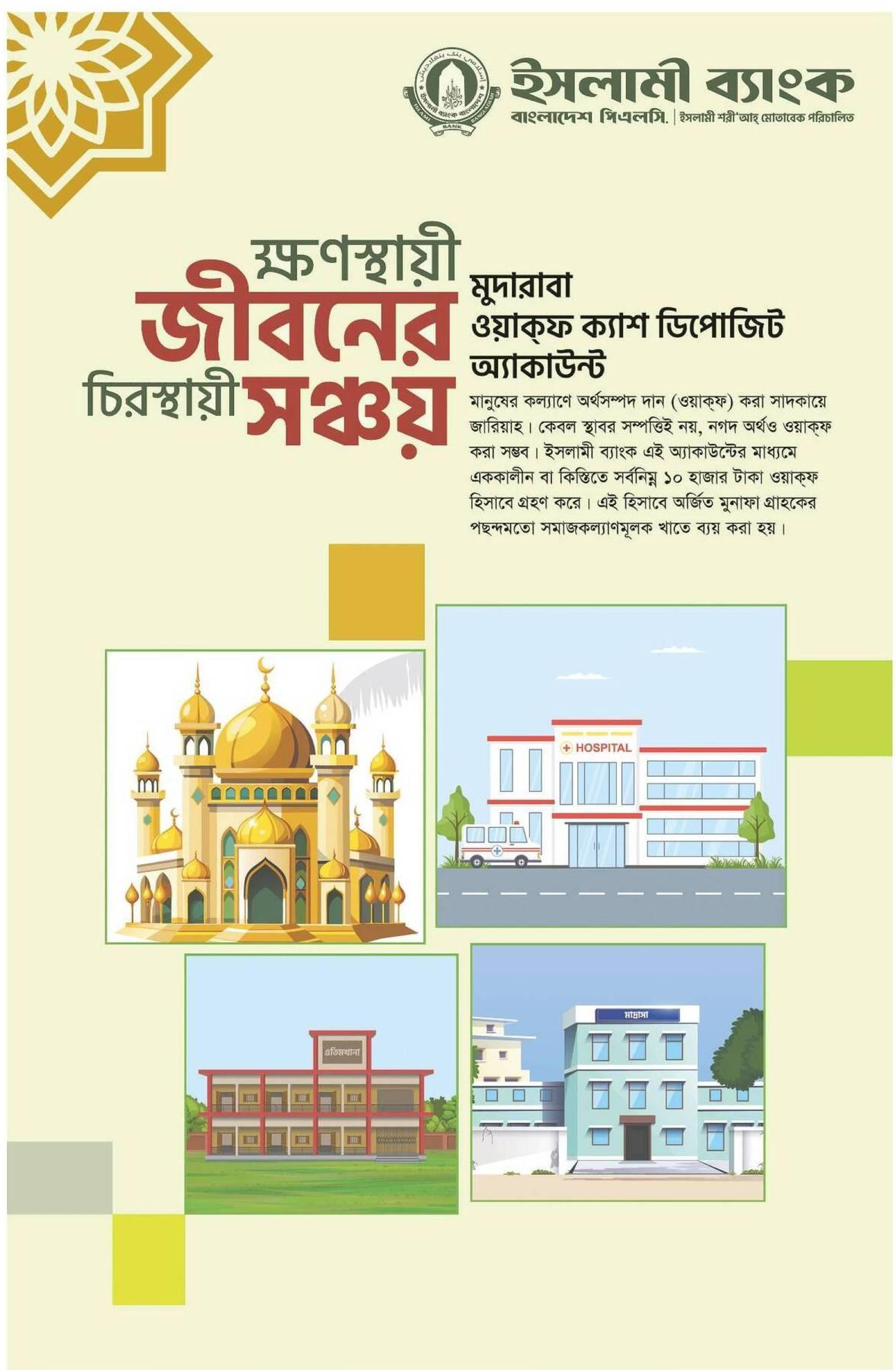

EBL SKY BANKING
Eastern Bank PLC.
সকল ব্যাংকিং সুবিধা
এখন এক অ্যাপ-এ
My Banking
Fund Transfer
Bill Payment
Virtual Prepaid Card
Schedule Transfers
Card Management
Account and Card Statement Download
U.S. Visa Fee Payment
QR Payment
Download Certificates
Good Morning
USER NAME
Account
104 •••••• 4173
Fund Transfer
Bill Payment
Card Payment
Recharge
Add Money
More
New
EBL Virtual Prepaid Card
Get Now
Card
Add Card, Activation & Explore Products.
Products
+ Add Card
Home
My Banking
QR
Explore
ব্যাংকিং মানেই
EBL Skybanking
দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ২০০ টিরও বেশি ব্যাংকিং সার্ভিস
উপভোগ করুন ইবিএল স্কাইব্যাংকিং অ্যাপ-এ
EBL 24X7 CONTACT CENTER
16230
or 09677716230
ebl.com.bd
myebl
To download
Scan the QR code
Google Play
App Store

এলিট-বিরোধিতার নাম করে পুরোনো বৈষম্য

মাহা মির্জা
উন্নয়ন অর্থনীতিবিষয়ক গবেষক ও শিক্ষক

মোদির ‘সেক্যুলার-এলিট’ বিরোধিতার রাজনীতি

মনমোহন-আমলে ভারতীয় কৃষকের আত্মহত্যা রেকর্ড ভেঙেছিল। কংগ্রেসের দুর্নীতির তালিকাও ছিল দীর্ঘ। তার ওপর আবার কংগ্রেস ‘সেক্যুলার’পন্থী, মুসলমানপন্থী। হিন্দুত্ববাদী বিজেপির জন্য এটা ছিল সুবর্ণ সুযোগ।

সেক্যুলার কংগ্রেসের সীমাহীন দুর্নীতির অসিলায় ভারতের সমগ্র ‘সেক্যুলার-এলিট’ গোষ্ঠীকেই সাধারণ ভারতীয়দের প্রধানতম শত্রু হিসেবে হাজির করা ছিল মোদির টার্গেট। এই টার্গেটের মধ্যে ছিল ভারতের ইংরেজিভাষী মিডিয়া, দেশি-বিদেশি এনজিও এবং পশ্চিমে শিক্ষিত অভিজাত ‘সিভিল সোসাইটি’।

আবার রাহুল-প্রিয়াঙ্কার মতো সোনার চামচ মুখে নিয়েও মোদি জন্মাননি, বরং ভাটনগর রেলস্টেশনের ঝুপড়ি চায়ের দোকান থেকে উঠে এসেছেন। মোদি তাই ভারতের ‘ওয়ার্কিং ক্লাস’-এর প্রতিনিধি। আর অন্যদিকে পরিবারতন্ত্র ও আভিজাত্যের প্রতীক গান্ধী পরিবার ভারতের কালো মানুষের জীবন থেকে বহুদূরে। বিজেপির রাজনীতিতে এলিটের ‘অ্যান্টিথিসিস’ হিসেবে তাই মোদির উত্থান। যা কিছু এলিট, মোদি তার উল্টো। মোদি রক্ষণশীল, চোস্ত হিন্দি বলেন, স্বদেশি খাদি পরেন, মোদি নিরামিষভোজী। মোদি পশ্চিমের আইভি লিগের পণ্য নন, মোদি মনমোহন-চিদাম্বরম-রাহুলের মতো অক্সফোর্ড-হার্ভার্ডে পড়েননি। পশ্চিমের তত্ত্ব দিয়ে ভারতের কৃষক-শ্রমিকের সর্বনাশ করেননি। পশ্চিমের কলোনিয়াল প্রভুদের বিপরীতে মোদির উপনিবেশবিরোধী রাজনীতি তাই দেশপ্রেমিক ইন্ডিয়ার ঝান্ডা।

কিন্তু বাস্তবে?

মোদির সঙ্গে ‘পশ্চিমের পণ্য’ মনমোহন-চিদাম্বরমের পার্থক্য কী? মোদি নাকি ভারতের ‘মিট্টি’ থেকে উঠে আসা? তাহলে ভারতের কয়েক লাখ কৃষক মোদির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিলেন কেন? ভারতের বহু বছরের গ্রামীণ মান্ডি ব্যবস্থাকে হটিয়ে আম্বানির অ্যাগ্রো-কোম্পানিকে খুশি করতে কৃষকবিরোধী বিল পাস করল কে? মাত্র এক রুপিতে ভাগলপুরের এক হাজার একর কৃষিজমি আদানির হাতে তুলে দিয়েছিল কে? ঝাড়খন্ডের হাজারো সাঁওতাল আদানির গোড্ডা পাওয়ার প্ল্যান্টের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল, অথচ মোদির পুলিশ ঠেঙাল কাকে? আদানিকে, না সাঁওতাল কৃষককে?

আদানির প্রাইভেট বিমানে চেপেই ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল নির্বাচনী প্রচারণাগুলো চালিয়েছেন মোদি। আদানি-আম্বানিকে একের পর এক বিদেশি প্রকল্প পাইয়ে দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় সমঝোতার ফলে পাঁচ বছরের মাথায় মুকেশ আম্বানির সম্পদ বেড়েছে পাঁচ গুণ। গৌতম আদানি হয়েছেন পৃথিবীর দ্বিতীয় শীর্ষ ধনী।

একদিকে ভারতের এক লাখ কৃষক সরকারি ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন মোদির আমলেই। এ সময় কংগ্রেসের তুলনায় কৃষি খাতের মজুরি কমেছে ১ দশমিক ৩ শতাংশ। একই সময়কালে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো থেকে আদানির কোম্পানিকে ঋণ দেওয়া হয়েছে প্রায় ৮০ লাখ কোটি টাকা!

স্মরণকালের সবচেয়ে বৃহৎ শ্রমিক আন্দোলনগুলোও মোদির আমলেই হয়েছে। মজুরি, পেনশন, সামাজিক নিরাপত্তা থেকে শুরু করে ভারতীয় শ্রমিকের ইউনিয়ন করার অধিকার, ধর্মঘট আর দর-কষাকষির অধিকারকে সংকুচিত করেছে। বলা হয়, ভারতের ওয়ার্কিং ক্লাসের ওপর এত বড় আঘাত আর আসেনি। অথচ সেই ব্রিটিশ আমল থেকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণির টানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসব আইন তৈরি হয়েছিল। শ্রমিকেরা বলছেন, ‘ইজ অব ডুইং বিজনেস’-এর নামে মোদির নতুন শ্রম আইন মূলত করপোরেট গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থকেই রক্ষা করবে।

এককথায়, সেক্যুলার-এলিটের গুষ্টি উদ্ধার করা ‘গরিবের বন্ধু’ মোদির কোনো পলিসিই আদতে গরিবের পক্ষে ছিল না, বরং মোদির আমলেই ভারতের ৪০ ভাগ সম্পদ চলে গেছে উঁচুতলার ১ ভাগ ধনীর হাতে, চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে না পেরে ৬ কোটি ভারতীয় নতুন করে দরিদ্র হয়েছে, ভারতের শিশুমৃত্যুর হার সাব-সাহারার দেশগুলোকে ছাড়িয়েছে, আর গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে ১২৫টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান দাঁড়িয়েছে ১১১তমতে। ডিমনিটাইজেশন থেকে লকডাউন—প্রতিটি ক্ষেত্রেই মোদির পলিসি ভারতের গরিবকে আরও গরিব করেছে। অথচ ভারতের ধনীকে আরও ধনী বানিয়ে গরিবের রবিনহুড সেজে বসে আছেন নরেন্দ্র মোদি।

ট্রাম্পের নকল এলিট-বিরোধিতা

ট্রাম্পের রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ারও সেই ‘এলিট’ ঘৃণা। মোদির মতোই ট্রাম্পের নিশানা আমেরিকার বামঘেঁষা মিডিয়া ও একাডেমিয়া, আর ‘লিবারেল’দের ‘এলিটপনা’র রাজনীতি।

সাধারণ মার্কিনরা মনে করেন যে অভিবাসীদের কারণে তাঁদের চাকরি যাচ্ছে। সেই চিন্তায় ঘি ঢালেন ট্রাম্প। সুশীলতার ভান তাঁর নেই। নেই হিস্প্যানিক, কালো বা মুসলমানদের পক্ষে দাঁড়ানোর দায়। ট্রাম্প তাই কালো-ঘেঁষা, মুসলমান-ঘেঁষা, বামঘেঁষা এলিটের বিরুদ্ধে ‘অর্ডিনারি’ আমেরিকানদের ‘কণ্ঠস্বর’।

কিন্তু এই এলিট-বিরোধী রাজনীতি কি আসলেই এলিট-বিরোধী? ওয়াল স্ট্রিটের বন্ধু, বৃহৎ কোম্পানির বন্ধু, একগাদা দামি হোটেলের মালিক ডোনাল্ড ট্রাম্প কেমন করে ওয়ার্কিং ক্লাসেরও বন্ধু হয়ে গেলেন? ট্রাম্পের প্রশাসনে আছে কেউ ‘ওয়ার্কিং ক্লাসে’র বন্ধু?

বরং আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যবসায়ীরা পদ পেয়েছেন ট্রাম্পের ক্যাবিনেটে। ইলন মাস্ক থেকে শুরু করে লিন্ডা ম্যাকমোহন, স্কট বেসেন্টসহ মোট ১৩ জন বিলিয়নিয়ার আছেন ট্রাম্পের ক্যাবিনেটে। ডিফেন্স সেক্রেটারি, মধ্যপ্রাচ্যের কনভয় বা সেক্রেটারি অব কমার্স—এঁরা সবাই আমেরিকার শীর্ষ ধনী ব্যবসায়ী। এঁদের মোট সম্পদের পরিমাণ ৪৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি।

লিবারেল-এলিটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই কী করলেন? আমেরিকার শীর্ষ ধনীদের জন্য প্রায় ১১৭ বিলিয়ন ডলারের এক অভূতপূর্ব ট্যাক্স-ছাড়ের ঘোষণা দিলেন। আবার ধনীদের এই সুবিধা দিতে গিয়ে শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো জরুরি সেবাগুলো থেকে বিপুল বাজেট সরানো হলো। একদিকে এলিট-ঘৃণার বাগাড়ম্বর, আরেক দিকে অভিজাত অলিগার্কদের সম্পদ বৃদ্ধিতে সরাসরি অবদান। শেষমেশ ট্রাম্পের প্রশাসন আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এলিটদের পিকনিক স্পট হয়ে দাঁড়াল।

> এক বছরে কয়েক শ কলকারখানা বন্ধ হয়েছে, এক লাখ শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন, মূল্যস্ফীতি বেড়েছে এবং পুরোনো সিন্ডিকেটগুলো আগের মতোই বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে।

বাংলাদেশে এলিট-বিরোধিতার বাগাড়ম্বর, বৈষম্য নিয়ে নীরবতা

আওয়ামী লীগ আমলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বড় মিডিয়া হাউস, এলিট অর্থনীতিবিদ এবং সরকারঘনিষ্ঠ কালচারাল গোষ্ঠী—সবাই মিলেমিশে একটা প্রভাবশালী নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছিল।

জনগণের বিপুল পরিমাণ টাকা লুটের বিরুদ্ধে তাঁরা মুখ খোলেননি, গুম-খুন-বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে প্রশ্ন করেননি। বরং সরকারি উন্নয়নের চটকদার বয়ানকে সরকারি প্রেসনোটের মতোই প্রচার করেছেন।

বৈষম্যের প্রতিবাদে প্রায়ই রাস্তায় নামেন পোশাকশ্রমিকেরা। ছবি : প্রথম আলো

এই সরকারি এলিট চক্রের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে একটা বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল। গার্মেন্টসের শ্রমিক, অটোরিকশাশ্রমিক বা উচ্ছেদ হওয়া কৃষকের আন্দোলনগুলোতে সাধারণ মানুষের সংহতি ছিল। মজুরির প্রশ্নে, চাকরির প্রশ্ন, মাংসের মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্নে, কলকারখানা বন্ধের প্রশ্নে, বৃহৎ প্রকল্পের অস্বাভাবিক খরচের প্রশ্নে একটা ঐকমত্য তৈরি হয়েছিল।

অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে পুরোনো মিডিয়া, পুরোনো ‘সেক্যুলার’-কালচারাল আধিপত্য এবং পুরোনো লুটেরা সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে তরুণেরা দাঁড়িয়েছেন। পুরোনো এলিটতন্ত্রের বিপরীতে তরুণদের এই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ছিল একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টেছে। অভ্যুত্থানের শক্তিগুলো টুকরো টুকরো হয়েছে। শত শ্রমিকের প্রাণের বিনিময়ে জুলাই এসেছিল, অথচ গরিব নিষ্পেষণের সেই পুরোনো অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত বলবৎ আছে। গত এক বছরে কয়েক শ কলকারখানা বন্ধ হয়েছে, এক লাখ শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন, মজুরির তুলনায় মূল্যস্ফীতি বেড়েছে এবং পুরোনো সিন্ডিকেটগুলো আগের মতোই বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। নতুন করে অতিদরিদ্র হওয়ার ঝুঁকিতে আছে ৩০ লাখ মানুষ। একদিকে বছরব্যাপী রাষ্ট্র সংস্কারের দীর্ঘ আলাপ, আরেক দিকে অবিরাম অর্থনৈতিক সংকট, কর্মসংস্থানহীনতা আর সম্পদ বণ্টনের কাঠামোগত বৈষম্য নিয়ে পুরোনো বা নতুন রাজনীতিবিদদের অনাগ্রহ ছিল বিব্রতকর।

এলিট বনাম মাদ্রাসা

অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মাদ্রাসার কিশোর-তরুণেরা সামনে এসেছে। পুরোনো অভিজাত ‘সেক্যুলার’ সম্প্রদায়ের মাদ্রাসাবিদ্বেষী অংশটির বিপরীতে গ্রাম ও শহরের মাদ্রাসাপড়ুয়া তরুণদের নতুন রাজনৈতিক পরিসর তৈরি হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, দেশের বেশির ভাগ মাদ্রাসার তরুণের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে লাখ লাখ শ্রমিক মা, বুয়া মা, রিকশাচালক বাবা, চাকরি হারানো কারখানাশ্রমিক বাবা অথবা সার-বীজের উপর্যুপরি মূল্যবৃদ্ধিতে ভেসে যাওয়া একেকটি কৃষক পরিবার। অর্থাৎ অগণিত মাদ্রাসা তরুণের আর্থসামাজিক জীবনপরিক্রমার সঙ্গে দেশের কয়েক দশকের অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা ও সম্পদ বণ্টনের কাঠামোগত দুষ্টচক্রের গভীর সম্পর্ক আছে।

অথচ একদিকে মাদ্রাসা তরুণদের জাতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত বিপর্যয়ের ঐতিহাসিক পাঠ ও পরিক্রমা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, আরেক দিকে এলিট-আধিপত্যের ‘অ্যান্টিথিসিস’ হিসেবে তাঁদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অথচ মাদ্রাসার তরুণের একমাত্র রাজনৈতিক সম্ভাবনা কি শুধুই ‘লিবারেল-সেক্যুলার’দের পিণ্ডি চটকানো? বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির প্রতিটি স্তরে মাদ্রাসার তরুণদের জড়তাহীন অংশগ্রহণ ও তার স্বতঃস্ফূর্ত অর্থনৈতিক সংগ্রামকে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বহীন করে দিল কারা? সেক্যুলার-এলিটের বংশ নিকুচি করাকেই তার একমাত্র রাজনৈতিক কর্ম হিসেবে প্রচার করল কারা? মাদ্রাসার তরুণ কি শুধুই আধুনিক নারীকে গালি দেওয়া মঞ্চের অডিয়েন্স? তাঁর নিজের ছোট্ট ভ্যানগাড়িটি নেই? অটোরিকশা নেই? গজ কাপড়ের ব্যবসা নেই? দুল-বালা-কসমেটিকসের দোকান নেই? বার্গার-মোমোর স্টল নেই? কম্পিউটার শেখার আকাঙ্ক্ষা নেই? এই বাংলাদেশে হাজারটা মাদ্রাসার তরুণ কখনোই দরজি, বাবুর্চি, নির্মাণশ্রমিক, ড্রাইভার, লাইনম্যান, টিভির মেকানিক, প্লাম্বার বা সেলসম্যানের কাজ করেননি? তাঁর মজুরি বৃদ্ধির দরকার নেই? আবাসনের সংকট নেই? ঋণের বোঝা নেই? মোটা চাল, ডিমের হালি, বিদ্যুতের বিল, দোকানভাড়া, বাসাভাড়া বা মায়ের চিকিৎসার খরচ নিয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষির জরুরত নেই? সেক্যুলার-এলিটের মুণ্ডুপাত করাকেই তাঁর একমাত্র বৈপ্লবিক কাজ হিসেবে নির্ধারণ করল কারা?

শ্রমিক বনাম সংস্কার

গত এক বছরে একাধিকবার গার্মেন্টসশ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়েছে যৌথ বাহিনী, প্রতিবারই বকেয়া বেতনের দাবিতে রাস্তায় নেমেছিলেন শ্রমিকেরা। গুলিতে শহীদ হয়েছেন মেশিন অপারেটর চম্পা, কাউসার ও রোকেয়া। অথচ শ্রমজীবীদের এই সংগ্রামে তথাকথিত এলিট-বিরোধী তরুণদের কোনো রাজনৈতিক ‘রা’ নেই। গত এক বছরে শত শত অটোরিকশা উচ্ছেদ হয়েছে, ডিএনসিসির বুলডোজার দিয়ে রিকশা, ভ্যান আর হকারদের খোলনলচে ছাতু করে ফেলা হয়েছে। আমরা হতবাক হয়ে দেখেছি, গরিবের সম্পদ ভাঙাভাঙির এই প্রক্রিয়ায় ‘মনিটর’ হিসেবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন একদল তরুণ ‘সমন্বয়ক’। একদিকে চাষাভুষার প্রতীক, গ্রামের কাদামাটি থেকে উঠে আসার রাজনৈতিক বয়ান, আরেক দিকে প্রবল অটোরিকশাঘৃণা আর হকারবিদ্বেষ। যেন হকার বা অটোরিকশা আসমান থেকে পড়ে। যেন এর সঙ্গে দেশের কৃষি অর্থনীতির বিপর্যয়ের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। যেন এই স্থানীয় শিল্পের আগে-পিছে গ্রামের কারিগর নেই, মেকানিক নেই, পেইন্টার নেই, গতর খেটে সংগ্রাম করা জুলাইয়ের বেকার তরুণটি নেই।

আজ এক বছর হলো সরকারি আউটসোর্সিং কর্মচারীরা দেশের প্রভাবশালী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়োগ-বাণিজ্যের বিরুদ্ধে টানা আন্দোলন করছেন। তাঁরা আমলাতন্ত্রের সংস্কারের কথা বলছেন। সরকারের ছয় লাখ পরিচ্ছন্নতাকর্মী, টয়লেট ক্লিনার, ওয়ার্ডবয়, আয়া, বুয়া, পাম্প অপারেটর, ড্রাইভার, বাবুর্চি ও পল্লী বিদ্যুতের কয়েক হাজার লাইনম্যান শ্রম সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের দাবি জানাতে গিয়ে রাস্তায় পুলিশের মার খাচ্ছেন। অথচ এই সব আন্দোলনের কেন্দ্রে আছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সম্পদবণ্টনের প্রশ্ন, বৈষম্য নিরসনের সুচিন্তিত ‘গাইডলাইন’। এই আন্দোলনগুলো তো সংস্কারকামী ও এলিট বন্দোবস্তবিরোধী রাজনীতিবিদদের জন্য ‘লিটমাস টেস্ট’ হওয়ার কথা ছিল। অথচ খোদ মাঠ থেকে উঠে আসা সংস্কারের এই দাবিদাওয়াগুলো সনদ-সংবিধান-সংস্কারের বলরুম পর্যন্ত পৌঁছাতেই পারল না।

শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারীদের ন্যায্য অর্থনীতি নিশ্চিত করতে হলে বা আমলা-ব্যবসায়ী-কোম্পানির এলিট বন্দোবস্ত ভাঙতে হলে কেবল চাষাভুষার পক্ষে ‘রেটোরিক’ দিয়ে চলবে? নয়া উপনিবেশবাদবিরোধী, এলিট-সেক্যুলারবিরোধী, ‘আমজনতা’র প্রতিনিধিত্বকারী নতুন বা পুরোনো রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আওয়ামী আমলের মাফিয়া শিল্পপতিদের সখ্য বা আর্থিক লেনদেনের অভিযোগগুলো কি বৈষম্য কমানোর সদিচ্ছার ইঙ্গিত দেয়?

খোদ মোদি আর ট্রাম্পই তো দেখিয়ে গেছেন, এলিট-বিরোধী বাগাড়ম্বরের রাজনীতিটা করাই হয় ধনী-গরিবের কাঠামোগত বৈষম্য লুকাতে।

দেশি ও বিদেশি মানদণ্ডে
ভালো ব্যাংক
সাফল্যমণ্ডিত ২৪ বছরে যমুনা ব্যাংক অর্জন করেছে অর্থনৈতিক শক্তিমত্তা, গ্রাহকের ঝুঁকিহীন বিনিয়োগ এবং আধুনিক ও উদ্ভাবনী ব্যাংকিং সেবা।
* সেরা প্রাইমারি ডিলার ব্যাংক পুরস্কার ৩৯ বার
* শীর্ষ টেকসই (সাসটেইনেবল) ব্যাংক
* AA1 দীর্ঘ মেয়াদি ক্রেডিট রেটিং
* অন্যতম সেরা করদাতা ব্যাংক
* ১৩.৫ লক্ষাধিক গ্রাহক নেটওয়ার্ক
যমুনা ব্যাংক

NAZAR
COMING INTO FOCUS
FIRST EXCLUSIVE ESSILORLUXOTTICA BRAND OUTLETS
GULSHAN CENTREPOINT | UTTARA CENTREPOINT
BURBERRY
VERSACE
Ray-Ban
MICHAEL KORS
PRADA
GIORGIO ARMANI
D&G
RALPH LAUREN
BVLGARI
EMPORIO ARMANI
A|X ARMANI EXCHANGE
OAKLEY
COACH
VOGUE
TIFFANY & Co.
CHANEL
POLO RALPH LAUREN
OLIVER PEOPLES

পারিবারিক জীবনে ‘নারী’, রাষ্ট্রীয় জীবনে ‘ব্যক্তি’

কৃষ্ণা দেবনাথ
সাবেক বিচারপতি, আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

অসময়ে আজানের ধ্বনি! ব্যাপার কী? না, তিন কন্যাসন্তানের পর রজব আলীর ঘরে পুত্রসন্তান জন্মেছে। শুধু তা-ই নয়। শুনতে পাচ্ছেন কি শঙ্খধ্বনি! উলুধ্বনি! ঠিকই ধরেছেন, নারায়ণ সরকার বড়ই ভাগ্যবান! প্রথমেই তার ঘর আলো করে এসেছে পুত্রসন্তান। দুই প্রতিবেশীর ঘরেই আজ আনন্দের বন্যা।

নারীর প্রতি বৈষম্য কিন্তু জন্মলগ্ন থেকেই শুরু। কন্যাভ্রূণ হত্যায় না-ই বা গেলাম। এই যে জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে জীবনের পরতে পরতে কন্যাসন্তানের প্রতি বৈষম্য, নারীর প্রতি বৈষম্য—এর জবাব দেবে কে?

চলুন, প্রথমে জেনে নিই, আমার কন্যারা, আমার নারীরা সন্তান, না কন্যাসন্তান? ব্যক্তি (পারসন) কি না? যদি ‘ব্যক্তি’ হয়ে থাকে, তবে সেখানে কোনো বৈষম্য আছে কি না? কী বলে আমাদের সংবিধান?

আমাদের সংবিধানের আর্টিকেল ২৭-এ নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, ‘সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।’

আর্টিকেল ২৮(১)-এ আছে, ‘কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।’

আর্টিকেল ২৮(২)-এ বলা আছে, ‘রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।’

আর্টিকেল ২৯(১)-এ বলা আছে, ‘প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।’ অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রীয়ভাবে নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই, সবাই সমান অধিকার লাভ করবে।

এবার সংবিধানের আর্টিকেল ৪১-এ আসুন। এই আর্টিকেল ‘ফ্রিডম অব রিলিজিয়ন’ অর্থাৎ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলেছে। চলুন, আমরা আর্টিকেল ৪১টি একটু দেখে নিই। আর্টিকেল ৪১ (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে (ক) ‘প্রত্যেক নাগরিকের যেকোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে’ মর্মে উল্লেখ করেছে।

অর্থাৎ ‘আইন’ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যেকোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার আছে। আর এই ‘আইন’ আমাদের পারিবারিক আইন, যে পারিবারিক আইন নারীকে সম-অধিকার দেয়নি।

আর এ কারণেই সংবিধানের আর্টিকেল ২৭-এ রাষ্ট্রীয়ভাবে নারী-পুরুষের সম-অধিকার স্বীকৃত হলেও আর্টিকেল ৪১-এর ‘ধর্মীয় স্বাধীনতা’র ‘সুগার কোটিং’ সত্ত্বেও পারিবারিক আইনের বাতাবরণে নারীকে পারিবারিক জীবনে নারীই থেকে যেতে হয়েছে; নারী পরিবারে ব্যক্তি বা সিটিজেন হতে পারেনি।

অর্থাৎ পরিবারে তুমি নারী। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে রাষ্ট্রীয় কর্মে তুমি ব্যক্তি বা সিটিজেন বা নাগরিক। এই যে নারী-পুরুষ নিয়ে রাষ্ট্রীয় ও পারিবারিক আইনের দোলাচল, এখানেই নারীর প্রতি বৈষম্য শুরু। এই বৈষম্যই আজকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

পরিবারে বৈষম্য

একবার ভাবুন, যে মুসলিম মেয়ে তার ভাইয়ের সঙ্গে একইভাবে বড় হলো, একই সঙ্গে বিসিএস দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হলো, সে তার পিতার অবর্তমানে ভাইয়ের সমান সম্পত্তি পাবে না, পাবে ভাইয়ের অর্ধেক সম্পত্তি। আর যদি সে হয় হিন্দু কন্যা, তবে তো কথাই নেই। ভাইয়ের উপস্থিতিতে পিতার অবর্তমানে সে কোনো সম্পত্তিই পাবে না। ভাইয়ের সঙ্গে সমযোগ্যতায় রাষ্ট্রীয়ভাবে আর্টিকেল ২৭-এর নারী-পুরুষের সমান অধিকার বলে ম্যাজিস্ট্রেট হলেও পারিবারিক জীবনে পারিবারিক আইনের কারণে নারী পুরুষের সম-অধিকার থেকে সে হয় বঞ্চিত, তা আপনি হিন্দু, বৌদ্ধ বা ইসলাম—যে ধর্মেরই হোন না কেন।

প্রথমেই শুরু করেছিলাম, ঠিক জন্মমুহূর্ত থেকে কন্যারা, নারীরা কীভাবে বৈষম্যের শিকার। সংসারে, পরিবারে নারী নারীই। ব্যক্তি নয়, সন্তান নয়। যতই আপনি কন্যাসন্তান জন্মের পর আহ্লাদিত হোন না কেন, যতই বলুন না কেন, আপনার চোখে কন্যা-পুত্র যা-ই হোক না কেন, সে ‘সন্তান’। কিন্তু আইন কি তা বলে? সমাজ কি তা বলে? আপনার কন্যাসন্তানটিকে আপনি আপনার পুত্রসন্তানের সমান সম্পত্তি ‘দান’ করে দিয়ে যেতেই পারেন। কিন্তু তা ‘দান’ই; কন্যার অধিকার নয়।

> যতই আপনি বলুন না কেন আপনার চোখে কন্যা-পুত্র যা-ই হোক না কেন, সে ‘সন্তান’। কিন্তু আইন কি তা বলে? সমাজ কি তা বলে?

একবার ভাবুন, পরিবারে একটি কন্যা জন্মই নিচ্ছে জন্মগত বৈষম্য নিয়ে। পরিবারে বেড়ে উঠছে বৈষম্য নিয়ে। জন্ম থেকে পরিবারে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বৈষম্যের মধ্যে যখন পুত্রসন্তান-কন্যাসন্তান বড় হতে থাকে, তখন তাদের মানসিক গঠনও কিন্তু এই বৈষম্যকে লালন করেই গড়ে ওঠে।

সংগত কারণেই পরিবারে ধর্মীয় আইন, সামাজিক আচার-আচরণ, যুগ যুগ ধরে চলে আসা চিন্তাভাবনার মধ্যে যে কন্যা বেড়ে ওঠে বা যে পুরুষ সদস্য প্রতিনিয়ত এসব ব্যবস্থাকে খুব স্বাভাবিক ভেবে নিয়ে দিন যাপন করতে থাকে, তাদের মনোজগতে নারী-পুরুষের বৈষম্যটি আসলেই বৈষম্য কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকাটাই স্বাভাবিক নয় কি?

এ অবস্থায় একজন নারী যখন আর্টিকেল ২৭-এর ‘নাগরিক’-এর সম-অধিকারে কর্মজীবনে প্রবেশ করে, তখন কিন্তু পরিবারের নারী-পুরুষ, পুত্র-কন্যা—সবার মনোজগৎ তৈরি হয়ে গেছে। মানে মানসিক গঠনের জল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে।

কর্মজীবনে বৈষম্য

এই মানসিক গঠন নিয়ে যখন একজন নারী কর্মজগতে প্রবেশ করে, তখন পরিবারে বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্যে বেড়ে ওঠা নারী ও পুরুষ—উভয়ের মধ্যেই তৈরি হয় এক দোলাচল। মাঝখান থেকে পরিবারের নারীটিকে কর্মজীবনে এক দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। পরিবারে নারী হয়ে থাকার কারণে তাকে পরিবার সামলাতে হয়। আবার আর্টিকেল ২৭-এ প্রাপ্ত সম-অধিকারের দাবিতে কর্মজীবনে প্রবেশের পর থেকে পরিবারের বৈষম্যকে পাশে ফেলে শুরু করতে হয় এক অসম দৌড়, নিজেকে প্রমাণ করতে হয় যে নারী কর্মজীবনেও পুরুষের সমকক্ষ। এসব অদৃশ্য মনোজগতের বৈষম্য হলেও দৃশ্যমান।

এবার আসুন দেখা যাক, কর্মজীবনে নিয়োগ থেকে পদোন্নতিতে নারীরা বৈষম্যের শিকার কি না!

প্রথমেই নিয়োগের ক্ষেত্রে আসুন। একবার চোখ রাখুন বিচার বিভাগে, ১৯৭৫ সালের পূর্বের চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে দেখতে পাবেন, মুনসেফ (বর্তমানে সহকারী জজ) পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ‘নারীরা এ পদে আবেদনের অযোগ্য’ কথাটি উল্লেখ থাকত। ১৯৭৫ সালে এই অচলায়তন ভেঙে নারীরা বিচার বিভাগে কর্মজীবন শুরু করে। পুরুষেরা কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব থেকেই এই দৌড় শুরু করেছিল। ঠিক সেভাবেই ১৯৮২ সালের পূর্বে বিসিএস (প্রশাসন)-এ কোনো নারী নিয়োগ পাননি। অপর দিকে ১৯৭৪ সালে পুলিশ বিভাগে প্রথম নারীরা যোগ দেন। সেনাবাহিনীতে ২০০০ সাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে নারীরা নিয়োগ পান। তার পূর্বে চিকিৎসক হিসেবে নারীরা নিয়োগ পেয়ে আসছিলেন।

এই তালিকা অনেক বড়। প্রতিবছর নারী দিবসে আমরা প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, প্রথম মহিলা স্পিকার, প্রথম মহিলা বিচারপতি, প্রথম মহিলা এভারেস্টজয়ী, প্রথম মহিলা..., প্রথম মহিলা..., প্রথম মহিলা...এর নাম দেখি, ছবি দেখি, তাঁদের ইন্টারভিউ দেখি, আর ভাবি, বাহ্ আমার দেশ এগিয়ে যাচ্ছে!

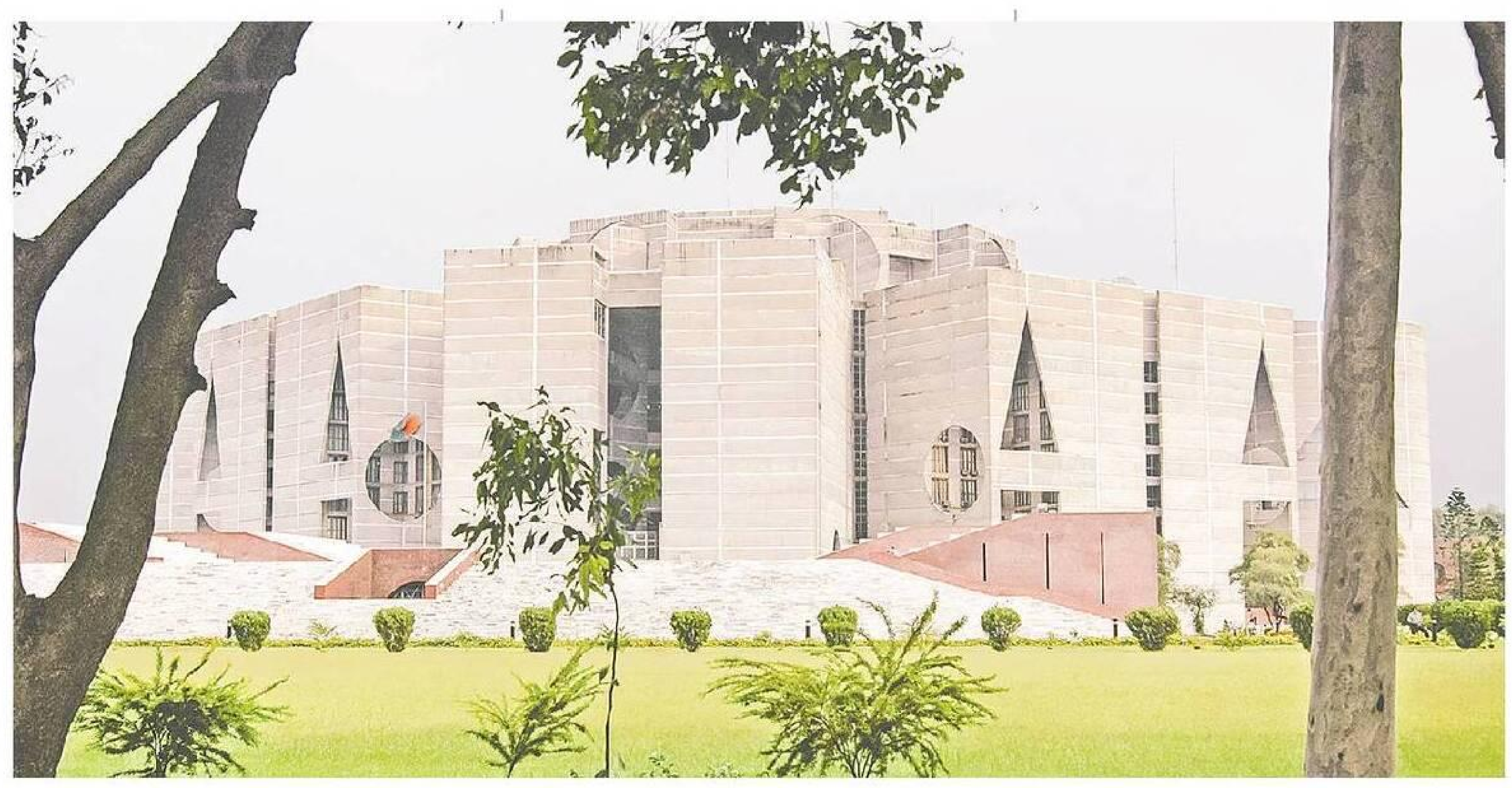

স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও সরাসরি নির্বাচনে জিতে সংসদ সদস্য হয়েছেন হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র নারী। ছবি : প্রথম আলো

কিন্তু আমরা ভাবি না, আমরা জানি না, ১৮ কোটির এই দেশে ৯ কোটির বেশি নারী রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যক্তি হলেও পারিবারিক জীবনে সে সন্তান নয়, ব্যক্তি নয়, শুধুই নারী।

আর এই ৯ কোটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিছুসংখ্যক নারী এই সংবিধানের কারণেই সম-অধিকার ভোগ করে কর্মজীবনে পুরুষের পাশে সমতালে চলেছেন। শুধু সেই সব নারীর পারিবারিক সহমর্মিতা আর সেই সব নারীর অর্জিত মেধার কারণে, মনোবলের কারণে।

নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া নারীকে আপনি পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারবেন না। আর নারীর ক্ষমতায়নের মূল ভিত্তিই হলো নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর উপস্থিতিটা বোধ হয় আমাদের পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

প্রথমে দেখা যাক, পরিবারে নারীর ক্ষমতায়ন। আগেই দেখেছি এই পরিবারে আপনি একজন নারী, কখনো ‘ব্যক্তি’ বা ‘সন্তান’ নন। কিন্তু দেখুন, পরিবারে যেখানে নারী পুরুষের সমকক্ষ নয়, সেখানেও কিন্তু আমাদের দেশে বহু পরিবারে নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অগ্রগামী। এর কারণ, হয় এসব নারীর অর্থনৈতিক কাঠামো অত্যন্ত জোরালো অথবা এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ অথবা তাঁদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, বিচক্ষণতা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের চেয়ে বেশি। সর্বোপরি পরিবারটি নারীর নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে তৈরি।

কিন্তু আসুন, যেখানে সংবিধান আপনাকে নারী-পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে, সেই কর্মজগতে নারীর ক্ষমতায়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চিত্রটি কী, একটু দেখে আসি।

আমরা জানি, নীতিনির্ধারণী বিষয়টি যুগ্ম সচিব থেকে শুরু করে সচিব পর্যায়ে হয়ে থাকে। এখন এই যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত যুগ্ম সচিব বা সচিব পর্যায়ে আমাদের নারীর অবস্থান কোথায়? বাংলাদেশে প্রশাসন ক্যাডারে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৩১ শতাংশ। নারীরা এই ক্যাডারে ১৯৮২ সালে প্রথম সুযোগ পেয়েছেন, সে হিসাবে এই হার নিতান্ত খারাপ নয়। সচিব পর্যায়ে বর্তমানে প্রায় ১৩ জন ও জেলা প্রশাসক পর্যায়ে ১৮-২০ জন নারী কর্মকর্তা আছেন। আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অবশ্যই আশাজাগানিয়া। কিন্তু এই সব নারী কর্মকর্তার উপস্থিতি নারীর ক্ষমতায়নে কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখবে, ভবিষ্যতের পরিসংখ্যানই তা বলে দেবে।

রাজনীতিতে বৈষম্য

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে কেবল নারী কর্মকর্তারা ক্ষমতায়নের শীর্ষে গেলেই যে নারীর অবস্থার উন্নতি হবে, তা নয়। নারীকে যেমন সচেতন হতে হবেন, তার ‘ক্ষমতা’ বুঝে নেওয়ার জন্য, তেমনি যোগ্য হতে হবে ‘ক্ষমতাবান’ হওয়ার জন্য। আবার পুরুষকেও তাঁর মনন, তাঁর চিন্তাচেতনা, তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতার অচলায়তন অবস্থান থেকে বের হয়ে আসতে হবে। নারীকে সম-অধিকারে সাহায্য করার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে।

চলুন, শেষ আশ্রয়স্থল সংসদের দিকে তাকাই। আমাদের দেশে এযাবৎ আমরা দুজন নারী প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি। নারীর ক্ষমতায়নের চমৎকার উদাহরণ। কিন্তু ক্ষমতার শীর্ষে যে নারীর অবস্থান, তৃণমূল পর্যায় থেকে উঠে না আসার কারণে নারীর ক্ষমতায়নে তা তেমন প্রভাব রাখতে পারেনি।

সংসদে আজও আমরা সরাসরি ভোটে নগণ্যসংখ্যক নারী সংসদ সদস্য পেয়েছি। বাকি ৫০ জন নারী সদস্যই মনোনীত। নারীকে ক্ষমতার মূল কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো আজ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়নি। যে নগণ্যসংখ্যক নারী সংসদ সদস্যকে আমরা সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে পেয়েছি, তাঁদের সংখ্যা এতটাই নগণ্য যে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে তাঁদের কণ্ঠস্বর পুরুষের কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি।

চলে যাই শিরোনামে। পারিবারিক ও কর্মজীবনে বৈষম্যের পরও আমার দেশের নারীরা কিন্তু নিজ চেষ্টায়, নিজ পরিশ্রমে, নিজ প্রজ্ঞায় ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও গার্মেন্টসশিল্পের যে অর্থনৈতিক অবস্থান বাংলাদেশকে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে, তার সিংহভাগ কৃতিত্বই কিন্তু নারী সমাজের।

আজকের নারী পারিবারিক জীবনে, সামাজিকতায়, পারিবারিক আইনে ‘ব্যক্তি’ না হওয়ার পরও নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার চেষ্টায় আছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীকে ‘ব্যক্তি’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরও কর্মজীবী নারীর দৌড় যেহেতু দেরিতে শুরু হয়েছে, সেহেতু তারা পিছিয়ে আছে অনেকটা পথ। পুরুষ সহকর্মী যদি এ পিছিয়ে পড়া নারী সহকর্মীদের হাত না ধরে, তবে এ পথচলা হবে দুরূহ।

সবশেষে বলতে চাই, দৃশ্যমান বৈষম্যকে চেনা যায়, ধরা যায়, প্রতিকার চাওয়া যায়, প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু অদৃশ্য বৈষম্যকে দূর করতে যে শিক্ষা, যে মনোজগৎ, যে পরিশীলিত চিন্তা, যে সহমর্মিতা প্রয়োজন, তা আমরা চিহ্নিত করতে পারব কি? যদি না পারি, তবে আসুন, চিহ্নিত করার পথ খুঁজি। আর যদি চিহ্নিত করতে পারি, তবে তার প্রতিকারে নেমে যাই, আজ, এখনই।

X Solutions Ltd.

প্রতিবন্ধীরা যেন এই সমাজের কেউ না

নাজিয়া জাবীন
প্রতিষ্ঠাতা, স্পর্শ ব্রেইল প্রকাশনা, শিশুসাহিত্যিক

তীব্র শীত থেকে বাঁচতে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে ডানা ঝাপটে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে উড়ে আসে পাখিরা। যার মধ্যে একটি দেশ বাংলাদেশ। ঠিক যে মুহূর্তে ওরা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে যাবে, সে মুহূর্তে নিরীহ পাখিদের বধ করে আমরা মাংস খাওয়ার উৎসবে মেতে উঠি। সামান্য দয়ামায়া, প্রকৃতির প্রতি এতটুকু ভালোবাসা নিয়ে আমরা অনেকেই বেড়ে উঠতে পারিনি। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ বা যাদের আশ্রয়ের বড় বেশি প্রয়োজন, তাদের একটু আশ্রয় দিতে, ভালোবাসতে অনেকেই আমরা শিখিনি।

আমরা অনেকেই বৃদ্ধ মা-বাবাকে সম্মান দিতে শিখিনি। পিতৃতুল্য শিক্ষকের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করতে শিখিনি। ফুলের মতো ছোট শিশুদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা উচিত, আমরা জানি না। অনেক পরিবারেই বিশেষ শিশু আছে। যে বিশেষ শিশুটি পরিবারে বেড়ে উঠছে বা উঠেছে, তাকেও বিশেষভাবে গ্রহণ করার বিষয়েও আমাদের রয়েছে শিক্ষার অভাব। সব ক্ষেত্রেই অহেতুক প্রতিযোগিতা, মারাত্মক বৈষম্য।

পরগাছার মতো জীবন

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের প্রয়োজন বিশেষ যত্ন। তারাও কিন্তু আদর বোঝে, মায়া বোঝে। তাদের আত্মসম্মানবোধ আছে, আছে বিশ্বাস, স্বপ্ন। কিন্তু পদে পদে বঞ্চনার শিকার হতে হতে, সবকিছু থেকে বঞ্চিত হতে হতে আপনজন, সমাজ বা রাষ্ট্রে পরগাছার মতো তারা বেঁচে থাকে। অথচ তাদের অনেকের প্রতিভা স্বাভাবিক অনেক শিশুর চেয়েও বেশি। একটু খেয়াল করলেই আমরা দেখতে পাই, আমাদের চারপাশে নানা রকম মানুষের বাস। কেউ স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় শারীরিক, মানসিক, সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতায় পিছিয়ে আছে। তাদের কারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অস্বাভাবিক, কারও বুদ্ধি কম, দেখা ও শোনার সমস্যা কারও, কারও আবার সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগের অসুবিধা। আচরণেও তারা অন্যের চেয়ে ভিন্ন হতে পারে।

এ ভিন্নতার পেছনে থাকতে পারে জিনগত সমস্যা, গর্ভাবস্থায় মায়ের স্বাস্থ্যগত সমস্যা, জন্মগত ত্রুটি, প্রসবকালীন জটিলতা, পরিবেশের খারাপ প্রভাব, মায়ের পুষ্টি, মানসিক অবস্থাসহ নানাবিধ কারণ। আবার দুর্ঘটনা, কঠিন অসুখে চিকিৎসার অভাব বা ভুল চিকিৎসায়ও মানুষ প্রতিবন্ধী হয়ে জীবনের বাকি সময় দুরূহ কষ্টে অতিবাহিত করে।

সড়ক দুর্ঘটনা বা অন্য কোনো মারাত্মক দুর্ঘটনা কেড়ে নিতে পারে বেঁচে থাকার সব আনন্দ। চলতে চলতে হঠাৎ বদলে যেতে পারে জীবনের গতি। চুরমার হয়ে যেতে পারে জীবনের স্বপ্ন। বাংলাদেশের জন্মের এত বছর পরও সড়ক দুর্ঘটনার জন্য কারও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।

অগ্নিকাণ্ডের ফলেও অনেকে প্রতিবন্ধিতা লাভ করতে পারে। যখন অগ্নিকাণ্ডটি ঘটে, তখন অনেক হইচই করলেও দুই দিন পর সব ভুলে যাই। দোষী ব্যক্তিদের কখনোই সামনে আসতে দেখা যায় না। অগ্নিদগ্ধ হয়ে যারা বেঁচে থাকে, তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে শুনিনি।

ভুল চিকিৎসায় অনেক শিশু, অনেক প্রাপ্তবয়স্ককে প্রতিবন্ধী হয়ে বেঁচে থাকতে হয়। চিকিৎসকদের জবাবদিহির কোনো উল্লেখযোগ্য খবর আমার চোখে পড়েনি।

অজ্ঞানতাবশত বিনা চিকিৎসায় অনেকেই বিকলাঙ্গ হয়ে পড়তে পারে বা হয়ে যায়। গ্রাম্য কবিরাজের তাবিজ, কবজ, পথ্য খেয়ে অনেকেই প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়।

যোগাযোগব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ার কারণে রোগীর চিকিৎসা পেতে দেরি হলেও ঘটতে পারে নানা সমস্যা।

বর্তমান সমাজে নেশাও প্রতিবন্ধিতার বড় একটি কারণ। কঠিন অসুখে ওষুধ সহজলভ্য না হওয়াও একটি কারণ।

পরিবার যদিও তাদের গ্রহণ করে, সমাজ ও রাষ্ট্র তাদের এড়িয়ে চলতে পারলেই বাঁচে। তা না হলে প্রতিদিন সময়মতো বাসস্ট্যান্ডে হাজির হয়েও কেন বাসে উঠতে পারেন না মর্জিনা। নির্ধারিত নম্বরের বাসও সেখানে আসে, কিন্তু মর্জিনাকে ফেলেই চলে যায় সে বাস। প্রতিদিন অফিসে যেতে তাঁর তাই দেরি হয়ে যায়। ওর কারণে নয়, বাসচালক ও তাঁর সহকারীর কারণে। সেটা তো বড়কর্তা মেনে নিতে চান না। কিন্তু প্রতিকারে নিজে কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন না। বুশরা, নাজিম, মোহিনী স্পর্শ করে বই পড়তে ভালোবাসেন, কিন্তু কজন মনে করে তাঁদের কথা? বইমেলা এলে হাজার হাজার বই প্রকাশ পায়, সরকার বা রাষ্ট্র কি পারে না তাঁদের পাশে দাঁড়াতে?

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা শিকল দিয়ে গাছের সঙ্গে বাঁধা থাকে দিনাজপুরের মির্জা। কাকডাকা ভোরে মা বেরিয়ে যান কাজে, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা। মা বাড়ি ফিরে এলেই মির্জার পেটে ভাত পড়ে। বর্ষা মাথায় ছাতা অথবা মায়ের গাল ঘেঁষে একটু স্নেহ।

মর্জিনাকে বাসে তুলে দিতে, নাজিমদের হাতে ব্রেইল বই তুলে দিতে অথবা মির্জার মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দিতে সমাজ, মহল্লা, প্রতিবেশীরা কেন এগিয়ে আসেন না? সমাজে নির্বিকার মানুষদের সংখ্যা যেন বেড়েই চলেছে।

যে পদক্ষেপগুলো নিতে হবে

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বারবার বলা হয়েছে বৈষম্য হ্রাস করার কথা, প্রতিবন্ধীদের সুযোগ-সুবিধার কথা।

তাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, ভাতা, যাতায়াত ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনমান উন্নয়নের নানা সরঞ্জাম সরবরাহের কথাও উল্লেখ করা আছে। বেসরকারিভাবে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন, তবে বিশেষ এই ব্যক্তিদের জন্য বিশেষভাবে পদক্ষেপ নেওয়া কিন্তু রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

ক. চাইলে সরকার ব্যবসার জন্য ব্যাংক থেকে বিনা সুদে তাদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে।
খ. তাদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।
গ. কৃত্রিম সহায়ক সরঞ্জাম ও ডিভাইসে ভর্তুকির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
ঘ. ট্রেন, বাস টার্মিনালে, অফিস-আদালতে শৌচাগারগুলো প্রতিবন্ধীদের ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হবে।
ঙ. হাসপাতালে স্বল্প মূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়া প্রয়োজন।
চ. ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করতে হবে।
ছ. খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
জ. টাকায় ব্রেইল ছাপের ব্যবস্থা করা।

সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রশিক্ষণ আর ট্রেনিংপ্রাপ্তদের চাকরির সংস্থান। সরকারি ও বেসরকারিভাবে অটিজম নিয়ে যেভাবে অনেক কাজ করা হয়েছে, প্রতিবন্ধিতার সব শাখায়ও সেভাবে গণসচেতনতা ও নানা কর্মকাণ্ড করা প্রয়োজন। আমাদের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ মানুষ যেখানে প্রতিবন্ধী, সেখানে রাষ্ট্রের, সমাজের প্রতিবন্ধীবান্ধব হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বেসরকারিভাবে এখানে কাজের প্রচুর সুযোগ আছে। যাঁরা এ ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁদের সাধুবাদ জানাই। আসুন, এই দেশটাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলি, সবার সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করি। দূর হোক বৈষম্য, দূর হোক অমানবিকতা।

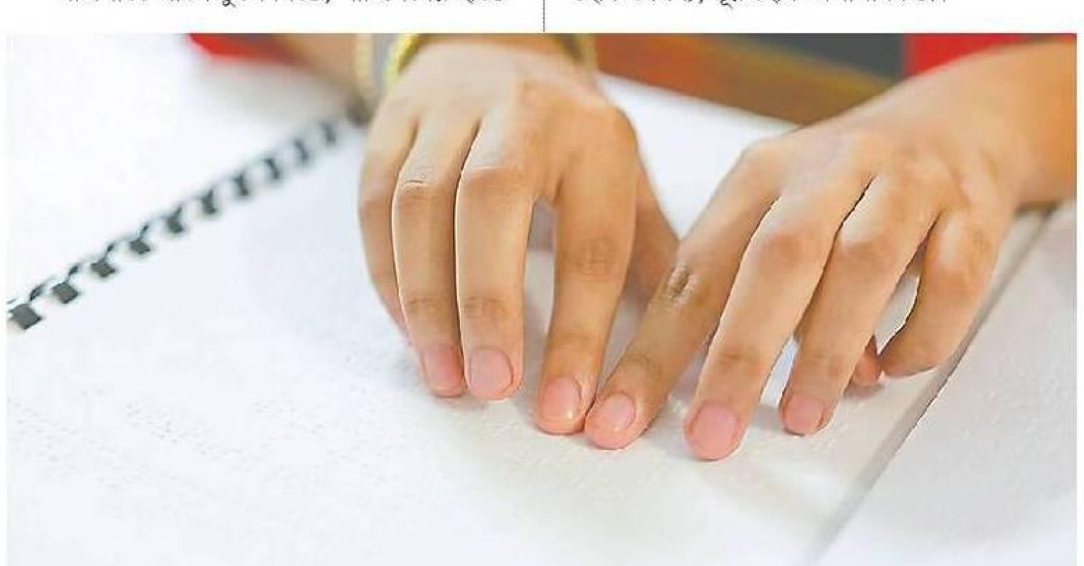

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পাঠকের কথা ভাবে কজন। ছবি : প্রথম আলো

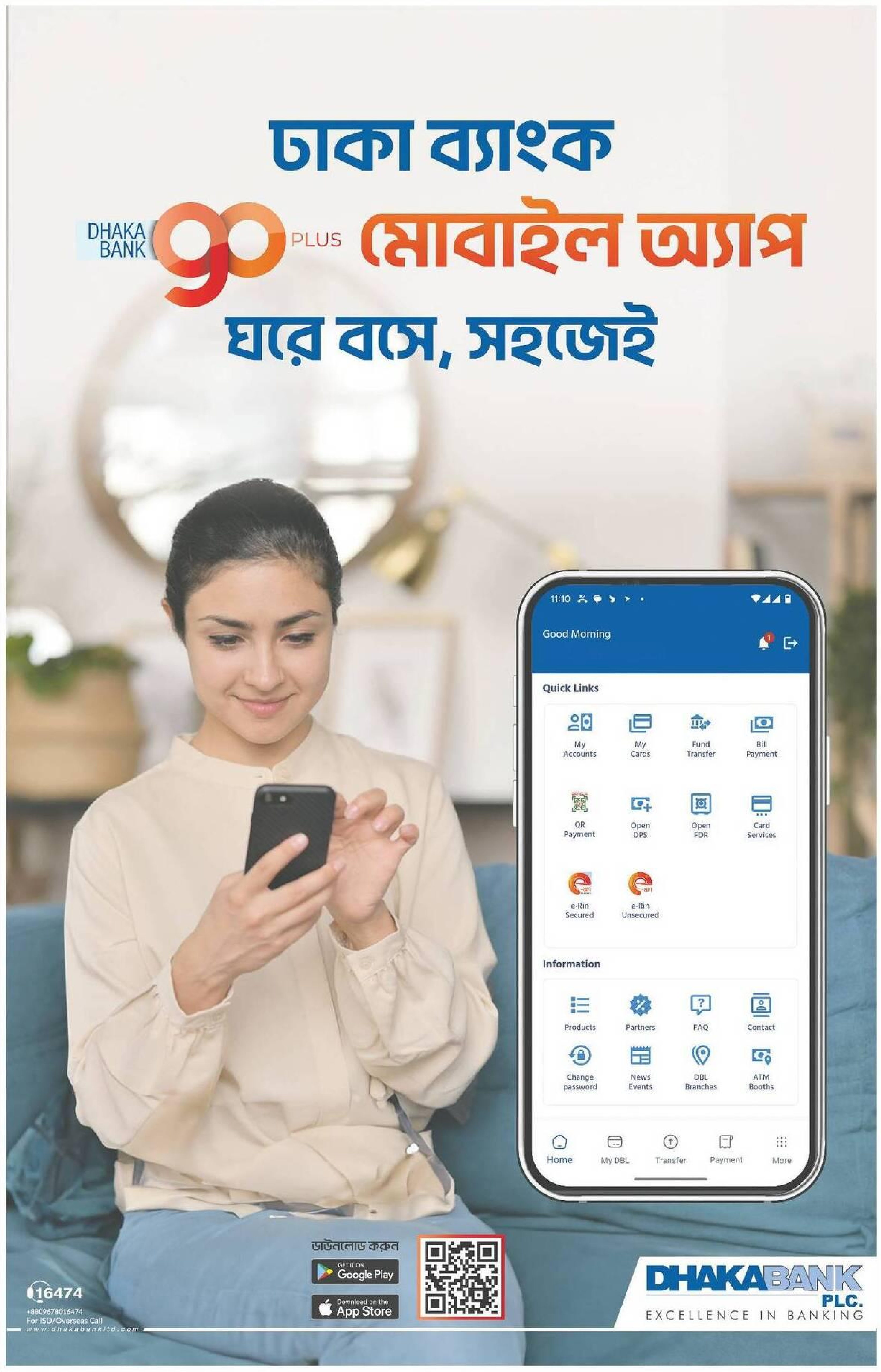

বৈষম্যের পিঁপড়া খেয়ে নিচ্ছে সাফল্যের গুড়

সায়মা হক বিদিশা

অধ্যাপক ও সহ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আর্থসামাজিক বিভিন্ন সূচকে গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্য থাকলেও অর্থনৈতিক বৈষম্য সেটাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য পরিমাপের সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি গিনি গুণাঙ্ক (গিনি কো-এফিশিয়েন্ট) অনুযায়ী অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েছে। ২০২২-এর খানা জরিপ অনুযায়ী গিনি গুণাঙ্ক বেড়ে হয়েছে দশমিক ৫০ এবং ২০২০ সালে যা ছিল দশমিক ৪৫। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বাড়ার বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয় যখন পরিসংখ্যানে উঠে আসে যে শীর্ষ ১০ শতাংশ ধনী দেশের প্রায় ৪১ শতাংশ আয়ের অধিকারী, ২০১৬ সালে যা ছিল প্রায় ৩৮ শতাংশ। অপর পক্ষে দরিদ্রতম ১০ শতাংশ খানা মাত্র ১ শতাংশের কিছু বেশি আয়ের মালিক (খানা জরিপ ২০২২, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)।

তবে আয়বৈষম্য বিবেচনায় আমাদের ভাবনাটা পরিসংখ্যানের বাইরে গিয়ে বাস্তবতার নিরিখে হওয়া উচিত। মনে রাখা জরুরি, খানা জরিপের নমুনা চয়নে সমাজের অতি ধনীদের উপস্থিতি অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই নগণ্য। ধনীদের সম্পদের সঠিক হিসাব না থাকা ও অপ্রদর্শিত সম্পদের কারণে জরিপে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সঠিক চিত্র উঠে আসে না। তাই বৈষম্যের প্রকৃত চিত্র পরিসংখ্যানের চেয়ে আরও অনেক ব্যাপক।

কর ও রাজস্বব্যবস্থার দুর্বলতা

ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে বলা চলে, অবৈধ অর্থনৈতিক লেনদেন, ঋণখেলাপি, কর ফাঁকি, সম্পদ পাচার তথা দুর্নীতির কারণে সমাজের একটি শ্রেণির কাছে বিপুল পরিমাণে অর্থ পুঞ্জীভূত হয়েছে। শ্বেতপত্র কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সময়কালে প্রতিবছর অন্তত ১৬ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খেলাপি ঋণ ও অন্যান্য মাধ্যমে আর্থিক খাত থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ। আয়বৈষম্যে এর প্রতিফলন পড়েছে।

দুর্নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সুশাসনের অভাব ছাড়াও করব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতা, কর ফাঁকি ও কর আদায়ে শ্লথগতির কারণে বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত এখনো মাত্র ৯ শতাংশ। এর ফলে প্রগতিশীল করকাঠামোর মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন ও ধনী-দরিদ্রের আর্থিক ব্যবধান কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে তেমন কোনো সুফল আমরা দেখছি না। পাশাপাশি আমাদের রাজস্বব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ করের অনুপাত মোট কর আদায়ের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। প্রত্যক্ষ কর যেমন অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে সহায়তা করে, তেমনি প্রত্যক্ষ করের পরিবর্তে পরোক্ষ করের (যেমন ভ্যাট) বোঝা ধনী ও দরিদ্র উভয়ের ওপরই সমানভাবে পড়ে। তাই পরোক্ষ করনির্ভর দুর্বল রাজস্ব আহরণব্যবস্থা বৈষম্য কমাতে সহায়ক হচ্ছে না। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের সীমাবদ্ধতা সামাজিক নিরাপত্তা খাতসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে জিডিপির ২ দশমিক ৫ শতাংশের কম ব্যয় করে—বৈষম্য নিরসন কিংবা দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যা নিতান্তই অপ্রতুল। এ ছাড়া রয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অস্বচ্ছতা ও অনিয়ম। মনে রাখা জরুরি, দারিদ্র্য আর অর্থনৈতিক বৈষম্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হলেও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো আয়বৈষম্য কমাতেও সাহায্য করতে পারে। সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্ত অনুসারে বাংলাদেশে প্রতি চারজনের একজন দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। পাশাপাশি একটি বড় জনগোষ্ঠীর নতুন করে দরিদ্র হয়ে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে এই চিত্র মোটেও স্বস্তিদায়ক নয়।

কর্মসংস্থান তৈরিতে শ্লথগতি

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও এর মাধ্যমে সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষের অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরেকটি অন্তরায় নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে শ্লথগতি। বিগত এক দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির তুলনায় নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে অপেক্ষাকৃত কম। অর্থনীতির ভাষায় এমপ্লয়মেন্ট ইলাস্টিসিটি অব গ্রোথ বা জিডিপির কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতার মান ২০১৬-২০২২ সময়কালে মাত্র দশমিক ৩৪। এটা প্রমাণ করে, প্রবৃদ্ধির সুফল সাধারণ মানুষের কাছে সেভাবে পৌঁছাচ্ছে না। এ কারণে বাড়ছে বৈষম্য।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের অন্যান্য কারণের বাইরে উচ্চ মূল্যস্ফীতির ভূমিকাও রয়েছে। চলতি বছরের আগস্ট মাসের মূল্যস্ফীতি ছিল প্রায় ৮ শতাংশ, যা ২০২৪ সালের আগস্ট মাসের তুলনায় কম (প্রায় ১০ শতাংশ, বিবিএস ২০২৫)

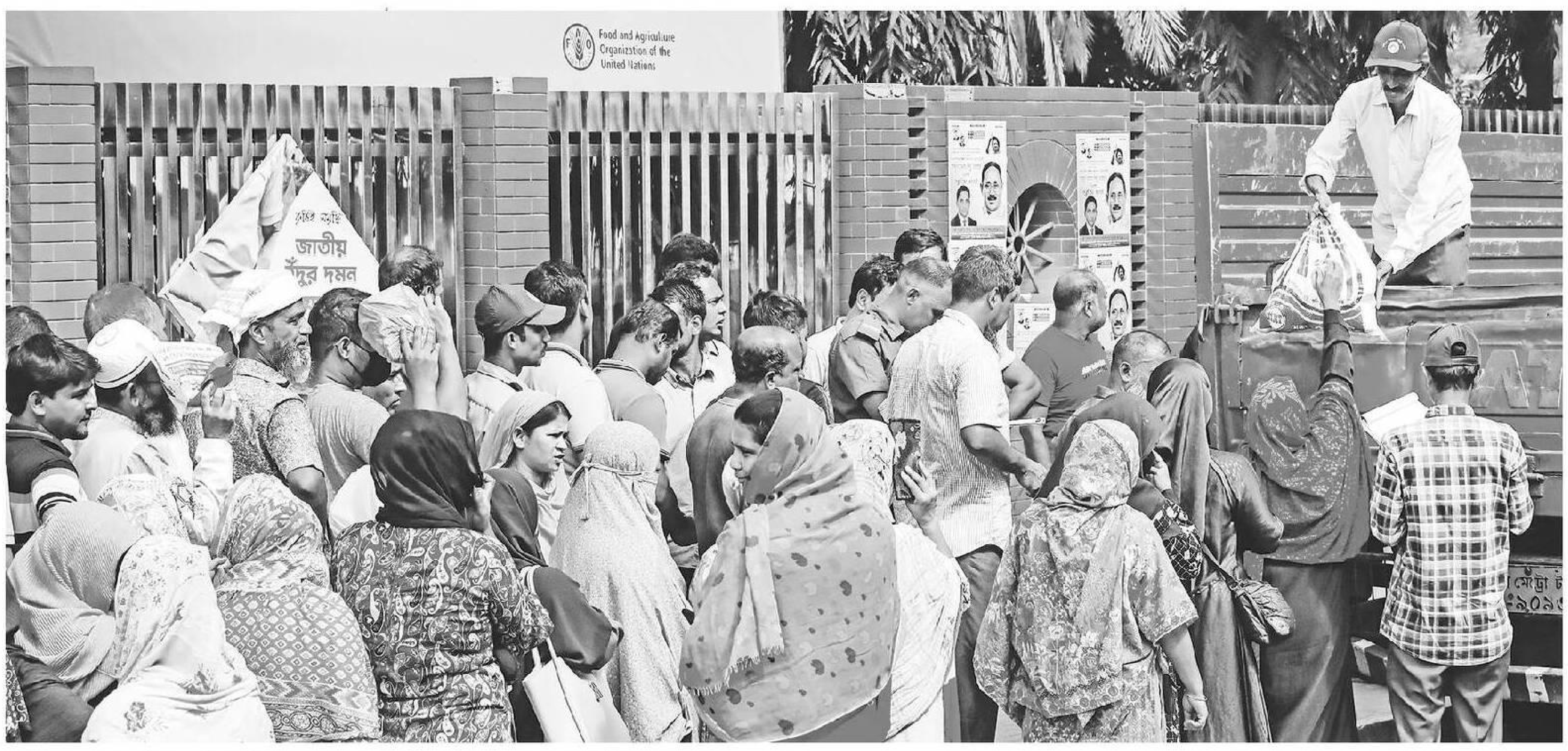

খোলাবাজারে পণ্য বিক্রি বাড়িয়ে নিম্ন আয়ের মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়া সম্ভব। ছবি : প্রথম আলো

হলেও মজুরি বৃদ্ধির হারের তুলনায় মূল্যস্ফীতি বেশি। এ কারণে প্রকৃত আয়ের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। দীর্ঘদিন ধরে চলা মূল্যস্ফীতির চাপ মোকাবিলার জন্য সামাজিক কর্মসূচি, বিশেষ করে টিসিবির খোলাবাজার কর্মসূচির অপ্রতুলতা ও অন্যান্য কর্মসূচির সীমাবদ্ধতার কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না; বাড়ছে ধনী-দরিদ্রের আয়ের ফারাক।

> শীর্ষ ১০ শতাংশ ধনী দেশের প্রায় ৪১ শতাংশ আয়ের অধিকারী। অপর পক্ষে দরিদ্রতম ১০ শতাংশ খানা মাত্র ১ শতাংশের কিছু বেশি আয়ের মালিক

মানব উন্নয়নে স্বল্প বিনিয়োগ

মানবসম্পদভিত্তিক অবকাঠামোয় স্বল্প বিনিয়োগ (২০২৫-২৬ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে প্রায় ১২ শতাংশ ও স্বাস্থ্য খাতে প্রায় ৫ শতাংশ বরাদ্দকৃত বাজেট), স্বাস্থ্যবিমার সীমিত ব্যবহার, নিজ খরচে উচ্চ স্বাস্থ্য ব্যয়, শিক্ষাক্ষেত্রে সমতাভিত্তিক সুযোগের অভাব ইত্যাদি যেমন দরিদ্র পরিবারগুলোকে চাপে ফেলছে, তেমনি শিক্ষার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সাপেক্ষে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ও সামাজিক গতিশীলতাও আশানুরূপ হচ্ছে না।

তবে কারণ যা-ই হোক না কেন, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা সার্বিকভাবে একটি সমতাভিত্তিক আর্থসামাজিক কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। বৈষম্য কমিয়ে আনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হতে পারে সঠিক করকাঠামো। করব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি, যেমন সমতাভিত্তিক বণ্টনব্যবস্থার দিকে যেতে সহায়তা করবে, তেমনি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়ক হবে। প্রত্যক্ষ করের ধাপগুলোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার, করজালের আওতা বৃদ্ধি, সম্পদ করের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপের মতো বিষয়গুলো বৈষম্য কমিয়ে আনার মূল চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করতে পারে।

তবে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বৈষম্য নিরসন সম্ভব। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে শ্রমঘন বৃহৎ শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সম্প্রসারণের জন্য সহায়ক নীতি প্রণয়নের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অতি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলোর জন্য সহজ শর্তে নিম্ন সুদে ঋণ, বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ, বাজারজাতকরণের সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তবে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিপর্যায়ের শিল্পকারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরিসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে শুধু কর্মসংস্থান নয়, শোভন কাজেরও ব্যবস্থা করা জরুরি।

খোলাবাজারে পণ্য বিক্রি ও রেশন-ব্যবস্থার পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে নিম্ন আয়ের মানুষকে মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়া সম্ভব। শহরাঞ্চলের বস্তিবাসী, যাঁদের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধা একেবারেই অপ্রতুল, তাঁদের জন্য বিশেষভাবে ভাবতে হবে। অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর ও জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বাড়ানোর পাশাপাশি এসব অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। বিভাগভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী (২০২২ খানা জরিপ) বরিশাল (প্রায় ২৬ শতাংশ, উচ্চ দারিদ্র্যসীমা অনুযায়ী) ও রংপুর বিভাগে (প্রায় ২৪ শতাংশ) দরিদ্রের হার সবচেয়ে বেশি। অঞ্চলভিত্তিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, যোগাযোগব্যবস্থা) নিশ্চিত করা গেলে দরিদ্রের হার কমিয়ে আনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বণ্টনের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

কন্যাশিশুদের জন্য শিক্ষা

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যহীন উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে নারী ও কন্যাশিশুদের জন্য শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি নিরাপদ ভৌত অবকাঠামো, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঋণের প্রাপ্ততা, জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিবেশ, মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ শিশু দিবাযত্নের ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে কিছু কিছু মৌলিক বিষয়ও আমাদের মনে রাখতে হবে। বিভিন্ন অধিকার ও সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা না আনা গেলে আর্থিক অবস্থা ও বণ্টনব্যবস্থায় সমতা আনা কঠিন। শিক্ষার ক্ষেত্রে সম-অধিকার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে সমাজের নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের উপার্জনের যৌক্তিক সুযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব। পাশাপাশি প্রয়োজন চাকরির ক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতাকে মূল বিবেচনায় রেখে তরুণদের জন্য বৈষম্যহীন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

তবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের মূলোৎপাটন করা তখনই সম্ভব যখন আর্থিক লেনদেন, নিয়োগপ্রক্রিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন ও কিছু ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন এই স্বচ্ছতা আনয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যেমন সরকারি ব্যয়) নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নব্যবস্থা থাকা জরুরি, যাতে জবাবদিহি নিশ্চিত হয়। ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন আর্থিক সুশাসন আনতে সহায়ক হতে পারে। বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়তে প্রয়োজন প্রগতিশীল ও কার্যকর করকাঠামো, সমতাভিত্তিক ব্যয় ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সর্বোপরি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিনির্ভর রাষ্ট্রব্যবস্থা।

বৈষম্যের দিন শেষ হবে একদিন

নাজিফা জান্নাত

সাবেক সমন্বয়ক, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ২০২৪

জানুয়ারি ২০১৮ : সংকল্পের দিন

এক সন্ধ্যায় ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একা বসে বসে নানা সামাজিক-অর্থনৈতিক চিন্তার সামনে মাথা হেঁট হয়ে আসছিল। মনকে প্রবোধ জানাতে পারছিলাম না—নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষের দুঃখ-কষ্ট, জরা, নদীপাড়ের ঘর হারানো কিংবা শহরের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ানো মলিন মুখের মানুষের জন্য কী করতে পারছি? নিজের আখের গোছানো ছাড়া আর কোনো ভাবনার পেছনেই তো দৌড়াচ্ছি না।

তত দিনে কোটা সংস্কার আন্দোলন, সড়ক আন্দোলনের টুকটাক অভিজ্ঞতা হয়েছে। দিনভর ক্লাস করি, সন্ধ্যায় ঢুঁ মারি ডিবেট ক্লাবের সেশনে।

সেই সন্ধ্যার পর বেশ কয়েক মাসের মনের তোলপাড় আমাকে নিয়ে গেল বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সংঘে। ভাবলাম, কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা, যোগ দিতে চাইলাম সে কাফেলায়, যেখানে পাব আরও সব সমমনা মানুষ।

কাঠামোগত পরিবর্তনের সে ভাবনার মূলে ছিল নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষ, সর্বোপরি রাষ্ট্রের সব নাগরিকের সমান মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের অভিপ্রায়। যার দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্রীয় কাঠামোব্যবস্থা, দূর হবে শ্রেণিভেদ বৈষম্য।

১৮ জুলাই ২০২৪ : স্বপ্ন দেখার দিন

এক আগুনের দিন। দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনকারীদের মনে শঙ্কা, ২০১৮ সালের মতো এবারও বুঝি মাঠে মারা গেল 'বৈষম্যবিরোধী কোটা সংস্কার আন্দোলন'। না, ঘটল খুবই অভাবনীয় এক বাঁকবদল। স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের সিলেবাসে না থাকা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রামপুরা থেকে উত্তরা, ঢাকা শহরের নানা প্রান্তে নেমে এল হাজারে হাজার।

বিজিবি, পুলিশ, সেনাবাহিনী, আওয়ামী-ছাত্রলীগের পান্ডাদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে মিছিলের কাতারে যোগ দিল। কী অসম আর দুঃসহ এক লড়াই। কী অবিশ্বাস্য বৈষম্যপূর্ণ এক লড়াই। আত্মরক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের হাতে রইল লাঠি, চোখে গগলস, মুখে মাখানো পেস্ট। আর সরকারি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তুলে নিল কাঁদানে গ্যাসের শেল, রাবার বুলেটসহ অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্র।

চাকরিতে কোটার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার দাবি নিয়ে যে শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেটি রূপ নিল নির্মম সহিংসতায়। শহীদ হলো ৪০ জনের বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

বৈষম্য দূরীকরণের আওয়াজ যারা তুলেছিল, অগ্নিঝরা স্লোগানে গলা মিলিয়েছিল, রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্য হিস্যা ও অহিংস শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালানোর জবাবদিহি চাইতে গিয়েছিল, তাদের অনেকেই শরীরে বুলেট, কাঁদানে গ্যাসের শেলের ভয়াবহ ক্ষত নিয়ে বেঁচে রইল।

সব ক্ষত, লাশের বিপরীতে ১৮ জুলাইয়ের রয়েছে ভিন্ন এক দিক। সেদিন যেন ছিল ভিন্ন ভিন্ন সুরের ঐকতানের দিন। কাঁধে কাঁধ রেখে দিনটা আমরা পার করেছিলাম। আন্দোলনের সমন্বয়কারী হিসেবে পেয়েছিলাম সহযোদ্ধাদের নিখাদ ভালোবাসা। আমার যা যা দায়িত্ব ছিল, সেসব যেন অক্লেশেই হয়ে যাচ্ছিল সহযোদ্ধাদের সহযোগিতায়। সহযোদ্ধাদের নির্দেশনা দিচ্ছিলাম আহত ব্যক্তিদের মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যেতে, কোনো সহিংসতামূলক কাজ না করতে, গুলি করতে করতে পাকড়াও হওয়া দুজন পুলিশ কর্মকর্তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে, সেদিন মাইক না থাকায় জমায়েত করে সবাইকে সন্ধ্যা নামার আগেই বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করতে—সবই তারা শুনেছিল পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে।

এ রকম এক বিরল অভিজ্ঞতার দিনে একফাঁকে কিছু মুহূর্তের জন্য বুকে কাঁপন ধরেছিল। ভাবছিলাম, এরাই তো আমার সহযোদ্ধা, জীবনের মহৎ ডাকে নিজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রাণের মায়াকে যারা তুচ্ছজ্ঞান করছে। হাজার হাজার মানুষ মিলে আমরা যেন এক অভিন্ন সত্তা হয়ে উঠেছি। কারও চোখে নেই লৈঙ্গিক বৈষম্যের খরদৃষ্টি, নেই পরিচয়ের রাজনীতির বাগাড়ম্বর। হাতে হাত রেখে সমাজ, রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া সব বৈষম্যের শেষ দেখে নেওয়াই যেন শেষ কথা।

৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ : স্বপ্নভঙ্গের দিন

জাতীয় সংসদ ভবনের একটি কক্ষে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছি আমিসহ নারীর রাজনৈতিক অধিকার ফোরামের প্রতিনিধিরা।

গণ-অভ্যুত্থানের পর কেটে গেছে এক বছরের বেশি। বিদ্যমান বৈষম্যপূর্ণ সিস্টেম বদলের উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকগুলো সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে। দিনবদলের সাথি হতে পারব বলে মনে বেশ আশার সঞ্চার হয়েছিল গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী দিনগুলোয়। কিন্তু দেখা গেল, আমাদের দিনবদলের কারিগরেরা নতজানু মানসিকতার, দৃঢ়প্রত্যয়ী নন। লৈঙ্গিক বৈষম্যের দোষে দুষ্ট।

মিটিংয়ে যাওয়ার আগেই আমরা জানতে পারি, নানাবিধ সংস্কার কমিশনের মধ্যে নারী সংস্কার কমিশন ও নির্বাচন সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে রাজনীতিতে ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর সমান অংশগ্রহণের জন্য যেসব প্রস্তাব রাখা হয়েছিল, সেগুলোর ৯৯ শতাংশই বাস্তবায়িত হচ্ছে না। নারীর জন্য সংস্কারপ্রক্রিয়া আটকে দিচ্ছে গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজপথে আগুনঝরা দিনের রাজনৈতিক সহযোদ্ধারা!

মিটিং চলাকালে খোদ ঐকমত্য কমিশনের প্রতিনিধির কাছ থেকে আমরা জানতে পারি, চারটি রাজনৈতিক দল ছাড়া অন্য সব রাজনৈতিক দলের রাজনীতিবিদেরা নির্বাচন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবিত সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে নারী প্রার্থীদের সরাসরি নির্বাচন এবং ইসি প্রস্তাবিত জাতীয় নির্বাচনে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি নিয়ে মাছের বাজারের মতো দরাদরি করেছেন, প্রস্তাবিত প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছেন অসংখ্যবার, নিয়মিত। শেষ পর্যন্ত জুলাই সনদে নারীর সংস্কারের প্রস্তাবগুলো গৃহীত হয়নি।

মিটিং চলাকালে মাছের বাজারের মতো দরাদরির কথা যখন শুনছিলাম, তখন উপহাসের হাসিও হাসতে পারছিলাম না। বিতৃষ্ণায় গলা জ্বলছিল। ভাবছিলাম, কয়েক মাস আগে নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ে 'জুলাইয়ের কন্যারা আমরা তোমাদের হারিয়ে যেতে দেব না' শিরোনামে করা একটি প্রোগ্রামের কথা। সেখানে জুলাই কন্যাদের দেওয়া হয় ক্রেস্ট। গণ-অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে টোকেন হিসেবে ব্যবহার করা হয় নারীদের। নারীদের সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও আন্দোলনের ভূমিকা নিয়ে বানানো হয় চাঞ্চল্যকর নানা ভিজ্যুয়াল।

কিন্তু কয়েক মাসের ব্যবধানে 'টোকেনিজম'কে ছাপিয়ে যথাযথ রাজনৈতিক-সামাজিক-লৈঙ্গিক সমতা নিশ্চিতের দরাদরির অকশনে আমরা হয়ে উঠি পণ্য। ইসি ঘোষিত ৩৩ শতাংশ নারীর সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা নারী অবান্ধব রাজনৈতিক দলের নেতারা এড়িয়ে গিয়েছেন। জাতীয় নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের দরাদরি শুরু ১২ শতাংশ থেকে, পরে এসে স্থির হয় ৫ শতাংশে, তা-ও আবার সেটি বাধ্যতামূলক নয়, ঐচ্ছিক।

শেষ পর্যন্ত নারীর বিপক্ষে যাওয়া রাজনৈতিক নেতারাই বনে যান নারীর রাজনৈতিক ভাগ্য নির্মাতা। কী নির্মম বৈষম্য!

ঐকমত্য কমিশনের একজন প্রতিনিধি স্বীকার করে নেন যে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রস্তাবের পক্ষে রাজি করাতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। সংরক্ষিত আসনসংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ১০০ করা ও সংরক্ষিত আসনে নারীর সরাসরি নির্বাচনসহ রাজনৈতিক অধিকার ফোরাম থেকে আমরা যে প্রস্তাবগুলো নিয়ে গিয়েছি, সেগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

মাথার ভেতর অনেক শব্দহীন কথা নিয়ে, ম্লান মুখে আমরা মিটিংয়ে ইস্তফা দিলাম।

১৫ অক্টোবর ২০২৫ : তবু স্বপ্ন দেখি

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে ২০২৫ পর্যন্ত বয়সকাল ৫৪ বছর ১০ মাস। এ সময়ে প্রতিটা সরকারই জনগণের জীবনমান পরিবর্তনের বাণী নিয়ে মাঠে হাজির হয়েছিল। কিন্তু বৈষম্যের অলাতচক্রেই বন্দী হয়ে রয়ে গেছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বৈশ্বিক সূচকে প্রায় তলানিতে বাংলাদেশের মান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের কাছাকাছি থাকা দেশগুলো যুদ্ধবিধ্বস্ত। বাংলাদেশের নাগরিকেরা বছরের পর বছর মৌলিক চাহিদা, মানসিক শান্তির খোঁজ করতে করতে হয়রান। কিন্তু প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম আশায় বুক বেঁধেছে বারবার। বুকের রক্ত দিয়ে শামিল হয়েছে তিন তিনটি ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানে।

মনে বিশ্বাস রাখি, ট্রাই অ্যান্ড এররের মধ্য দিয়েই মানবসভ্যতা এগিয়েছে। গত ৫৩ বছরে যেসব সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-লৈঙ্গিক-জাতিগত-শ্রেণিগত বৈষম্য বাংলাদেশ থেকে দূর করা সম্ভব হয়নি; টু বি অর নট টু বির দোলাচল কাটিয়ে তার বিপরীত দিকটাকে আমরা ছোট ছোট ঐক্যের বড় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বাস্তব করে তুলব।

বুকভর্তি আশা আমাদের সাহস জোগায়, আর সাহসের চেয়ে বেশি সংক্রামক কীই-বা আছে এই পৃথিবীতে!

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH
২য় পর্ব
নতুন বই : অক্ষরের নিঃশব্দ অনুরণন

২৭. হরিশংকর জলদাস
ঘটোৎকচ (উপন্যাস) [মুদ্রিত মূল্য: ৭০০]
২৮. ইমতিয়ার শামীম
উপন্যাস সংগ্রহ-১ [মুদ্রিত মূল্য: ৮০০]
২৯. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
বক্তৃতা সমগ্র [মুদ্রিত মূল্য: ১০০০]
৩০. বদিউদ্দিন নাজির
বাংলাদেশে গ্রন্থ প্রকাশনা (গ্রন্থ প্রকাশনার ইতিহাস) [মুদ্রিত মূল্য: ৮০০]
৩১. ওয়াসি আহমেদ ও ইমতিয়ার শামীম সম্পাদিত
- বাংলাদেশের পাঁচ দশকের গল্প-১ [মূল্য: ৮০০]
- বাংলাদেশের পাঁচ দশকের গল্প-২ [মূল্য: ৮০০]
৩২. মো. সফিকুল ইসলাম
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বাংলার ইতিহাসচর্চার পথিকৃৎ (প্রাচীন ইতিহাস) [মুদ্রিত মূল্য: ১০০০]
৩৩. হারুন রশীদ
রাজকীয় জলদস্যু বণিক সমিতি (ইতিহাস)
মুদ্রিত মূল্য: ৬০০
৩৪. সংকলন ও সম্পাদনা সৌভিক রেজা
অমিয় চক্রবর্তী: সাক্ষাৎ ও সন্ধানের ভাষ্য (সাহিত্য সমালোচনা) [মুদ্রিত মূল্য: ৬০০]
৩৫. রাজু আলাউদ্দিন
ভাষার প্রতিভা, বিকৃতি ও বিরোধিতা (ভাষা বিতর্ক)
মুদ্রিত মূল্য: ৩৫০
৩৬. আবু হেনা মোস্তফা এনাম
সংগ্রহ সম্পাদনা ভূমিকা
কথার সঘন করতল: মাহমুদুল হকের সাক্ষাৎকার
মুদ্রিত মূল্য: ৬৫০
৩৭. ফেদেরিকো ফিনচেলস্তাইন
ফ্যাসিবাদী মিথ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (রাজনৈতিক দর্শন)
অনুবাদ মাসুদ আলম
[মুদ্রিত মূল্য: ৬০০]
৩৮. রওশন জামিল
ক্রিওল সুন্দরী (অনুবাদ উপন্যাস)
মুদ্রিত মূল্য: ৫৫০
৩৯. বেগম আকতার কামাল
মন: কহন না যায় (মনোবিশ্লেষণ)
মুদ্রিত মূল্য: ৪০০
৪০. অধ্যাপক ডা. সানজিদা শাহরিয়া
আত্মহত্যা: ইতিহাস, কারণ ও নিবারণ (মনোবিশ্লেষণ) [মুদ্রিত মূল্য: ৪০০]
৪১. মামুন হুসাইন
বিষণ্নতা : হৃদয়ে নির্জনতা (মনোবিশ্লেষণ)
মুদ্রিত মূল্য: ৪০০
৪২. ইমরান কামাল
হাসি : কৌতুকের মনস্তত্ত্ব (মনোবিশ্লেষণ)
মুদ্রিত মূল্য: ৪০০
৪৩. তারানা নূপুর
ঈর্ষা : হৃদয়ের কাঁটাঝোপ (মনোবিশ্লেষণ)
মুদ্রিত মূল্য: ৪০০
৪৪. সম্পাদনা সিরাজ সালেকীন
মুনীর চৌধুরী: শতবার্ষিক পাঠ (প্রবন্ধ)
মুদ্রিত মূল্য: ৪০০
৪৫. ইমতিয়ার শামীম
নতুন কবিতার কাল (সমাজ গবেষণা)
মুদ্রিত মূল্য: ৫০০
৪৬. অশোক বিশ্বাস
হিন্দুধর্মে জাতিবর্ণবিদ্বেষ ও মানবতাবিরোধী চিন্তা (সমাজ গবেষণা) [মুদ্রিত মূল্য: ৫০০]
৪৭. অনুবাদ ও সম্পাদনা আখতার হুসেন
জার্মানির রূপকথা
মুদ্রিত মূল্য: ৩০০
৪৮. রবিউল কমল
ভয়ংকর বাগানবাড়ি (কিশোর গোয়েন্দা উপন্যাস)
মুদ্রিত মূল্য: ৩০০
৪৯. মোহাম্মদ হাননান
সমুদ্রের অতলতলে দুঃসাহসিক হাজার কিলো (সায়েন্স ফিকশন) [মুদ্রিত মূল্য: ৩০০]
৫০. অদ্বৈত মারুত
গোলপাহাড়ের ঘোড়া (কিশোর উপন্যাস)
মুদ্রিত মূল্য: ২৫০

আগের বই, অসীমের সৈকতে

- আহমাদ মোস্তফা কামাল
রূপ-নারানের কূলে (ছোটোগল্প)
মুদ্রিত মূল্য : ৪০০
- প্রশান্ত মৃধা
নির্বাচিত গল্প (ছোটোগল্প)
মুদ্রিত মূল্য : ৭০০
- আফসানা বেগম
অন্তরালের ঘোরে (ছোটোগল্প)
মুদ্রিত মূল্য : ৪০০
- মাহরীন ফেরদৌস
অরিগামির গোলকধাঁধায় (ছোটোগল্প)
মুদ্রিত মূল্য : ২০০
- মামুন হুসাইন
স্বরচিত আত্মার পরিত্রাণ (উপন্যাসিকা)
মুদ্রিত মূল্য : ২০০
- ইমতিয়ার শামীম
শঙ্খগহন সলপকাল (উপন্যাস)
মুদ্রিত মূল্য : ৭০০
- মাহরীন ফেরদৌস
জলজ লকার (উপন্যাস) [মুদ্রিত মূল্য : ৬০০]
- সনৎকুমার সাহা
ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে : রেনেসাঁ থেকে সমাজতন্ত্র (প্রবন্ধ)
মুদ্রিত মূল্য : ৩৫০
- বেগম আকতার কামাল
রবীন্দ্রনাথের এশিয়া দর্শন (সাহিত্য গবেষণা)
মুদ্রিত মূল্য : ২৫০
- সৈয়দ আজিজুল হক
মন ও মনন (প্রবন্ধ)
মুদ্রিত মূল্য : ৩৫০
- সিরাজ সালেকীন (সম্পাদিত)
ভিক্ষুকের গান : জীবন-জীবিকার সুরলিপি (সমাজ গবেষণা)
মুদ্রিত মূল্য : ৪০০
- রবিউল হোসেন
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি : সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা (সমাজ গবেষণা)
মুদ্রিত মূল্য : ৬০০
- আলম খোরশেদ
অনুবাদসমগ্র (ছোটোগল্প)
মুদ্রিত মূল্য : ৮০০
- আফরোজা সোমা
আন্ডারস্ট্যান্ডিং ম্যাক্‌লুহান : গণমাধ্যম, নয়ামাধ্যম ও সমাজ (ব্যক্তিত্ব পরিচয়)
মুদ্রিত মূল্য : ৩০০
- আনিসুল হক
প্রেরণার গল্প (মোটিভেশন)
মুদ্রিত মূল্য : ২০০

বিজ্ঞাপনটির ছবি তুলে আমাদের WhatsApp করুন, কিংবা হটলাইনে কল করে বুঝে নিন ৩০% ছাড়!
৩০% ছাড়!
WhatsApp/Hotline
01324 25 46 31
অনলাইন অর্ডার
kathaprokash.com
kathaprokash
অক্ষর চলবে নক্ষত্রজুড়ে

নারী শ্রমিকের প্রতি বৈষম্য আর কত দিন

কল্পনা আক্তার

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ
সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটি

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ নারী শ্রমিকদের কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তৈরি পোশাক, কৃষি, চা-বাগান, গৃহকর্ম, নির্মাণ, হোটেল-রেস্তোরাঁ, এমনকি আইটি বা সেবা খাতেও নারী অগ্রগতি ও টিকে থাকার প্রতীক। অথচ এই নারীরাই কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ বৈষম্যের শিকার। মজুরি, নিরাপত্তা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, নেতৃত্ব বা সামাজিক মর্যাদা—সবখানেই তাঁদের ঘিরে রেখেছে অদৃশ্য দেয়াল।

এই বৈষম্য শুধু লিঙ্গভিত্তিক নয়, এটি শ্রেণি, কাঠামো আর মানসিকতার প্রতিফলন; রাষ্ট্রীয় নীতি, শ্রমবাজার ও সমাজের প্রতিটি স্তরে যা বিদ্যমান।

নারী শ্রমিকদের অবদান ও অবস্থান

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২৪ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৪ দশমিক ২ শতাংশ নারী।

২০১৭ সালে এই হার ছিল মাত্র ৩৬ শতাংশ, অর্থাৎ গত এক দশকে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, কিন্তু তাঁদের কাজের মান ও মর্যাদা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়েনি।

তবে এই ৪৪ দশমিক ২ শতাংশের মধ্যে প্রায় ৯৬ দশমিক ৬ শতাংশ নারী অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত (বিশ্বব্যাংক, ২০২৪)। অর্থাৎ তাঁরা কৃষি, গৃহকর্ম, চা-বাগান, গৃহকেন্দ্রিক কাজ, দোকান বা ছোট উৎপাদন ইউনিটে কাজ করেন, যেগুলো শ্রম আইন বা সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আসেনি।

নারীর এই বিশাল অবদান সত্ত্বেও তাঁদের মজুরি, কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিরাপদ, অনিয়ন্ত্রিত ও অবমূল্যায়িত।

খাতভিত্তিক বৈষম্যের চিত্র

তৈরি পোশাক খাত

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশ আসে তৈরি পোশাকশিল্প থেকে, যেখানে কাজ করেন প্রায় ৪০ লাখ নারী। কিন্তু একই কাজে পুরুষের তুলনায় নারীরা গড়ে ২১ শতাংশ কম মজুরি পান (আইএলও, ২০২৩)।

বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটির মাঠ জরিপে দেখা যায়, নারী কর্মীদের মধ্যে ৭৩ শতাংশ কখনো পদোন্নতি পাননি। ৬৮ শতাংশ জানিয়েছেন, মাতৃত্বকালীন ছুটি নিলে তাঁদের চাকরি ঝুঁকিতে পড়ে।

কৃষি খাত

গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও কৃষিজমির মালিকানায় তাঁদের অংশ মাত্র ১২ শতাংশ (বিবিএস, ২০২৩)। নারী কৃষিশ্রমিকেরা সাধারণত মৌসুমি বা দৈনিক মজুরিতে কাজ করেন, যেখানে তাঁদের মজুরি পুরুষের তুলনায় গড়ে ৩০ শতাংশ কম। অনেক সময় 'সহায়তাকারী শ্রম' হিসেবে নারীর কাজ গৃহস্থালির অংশ ধরা হয়, ফলে তাঁদের কাজের কোনো আর্থিক মূল্য নির্ধারিত হয় না।

গৃহকর্ম খাত

বাংলাদেশে প্রায় ২০ লাখ নারী গৃহকর্মীর কাজ করেন (ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স রাইটস নেটওয়ার্ক, ২০২৩)। তাঁদের অধিকাংশেরই কোনো লিখিত চুক্তি নেই, নেই কোনো নির্ধারিত কাজের সময়, দেওয়া হয় না ন্যায্য ছুটি বা মজুরি। শহরের বেসরকারি গৃহকর্মীদের মাসিক গড় আয় ৭ হাজার টাকা, যা জাতীয় ন্যূনতম মজুরির অর্ধেকও না।

চা-বাগান ও কৃষিশিল্প

চা-বাগানশ্রমিকদের মধ্যে ৭০ শতাংশ নারী। তবু তাঁরা দিনে মাত্র ১৭০ থেকে ১৮৫ টাকা মজুরি পান (জাতীয় মজুরি বোর্ড, ২০২৩)। এখানকার নারী শ্রমিকদের অনেকেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক গতিশীলতা থেকে বিচ্ছিন্ন; প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাগানের ভেতরে সীমাবদ্ধ জীবন যাপন করেন তাঁরা। একজন নারী শ্রমিক বাগানে আট ঘণ্টা টানা কাজ করেন; কিন্তু সেখানে কোনো ধরনের টয়লেট সুবিধা নেই। এটি শুধু শ্রম অধিকারই না, মানবাধিকারেরও চরম লঙ্ঘন।

নির্মাণ ও সেবা খাত

নির্মাণশিল্পে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু নিরাপত্তা ও মর্যাদা কমছে (আইএলও-বিজিএমইএ রিপোর্ট, ২০২৪ অনুযায়ী), নির্মাণ সাইটে নারী শ্রমিকদের মধ্যে ৬০ শতাংশ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম পান না।

সেবা খাত যেমন হোটেল, রেস্তোরাঁ বা বিউটি পারলারে নারীরা দীর্ঘ সময় কাজ করলেও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে থাকেন, ফলে তাঁদের শ্রমের মূল্য ও অধিকার অনির্দিষ্ট থাকে। চাকরি, বেতন ও অন্যান্য আইনগত অধিকার থেকে তাঁরা রীতিমতো বঞ্চিত।

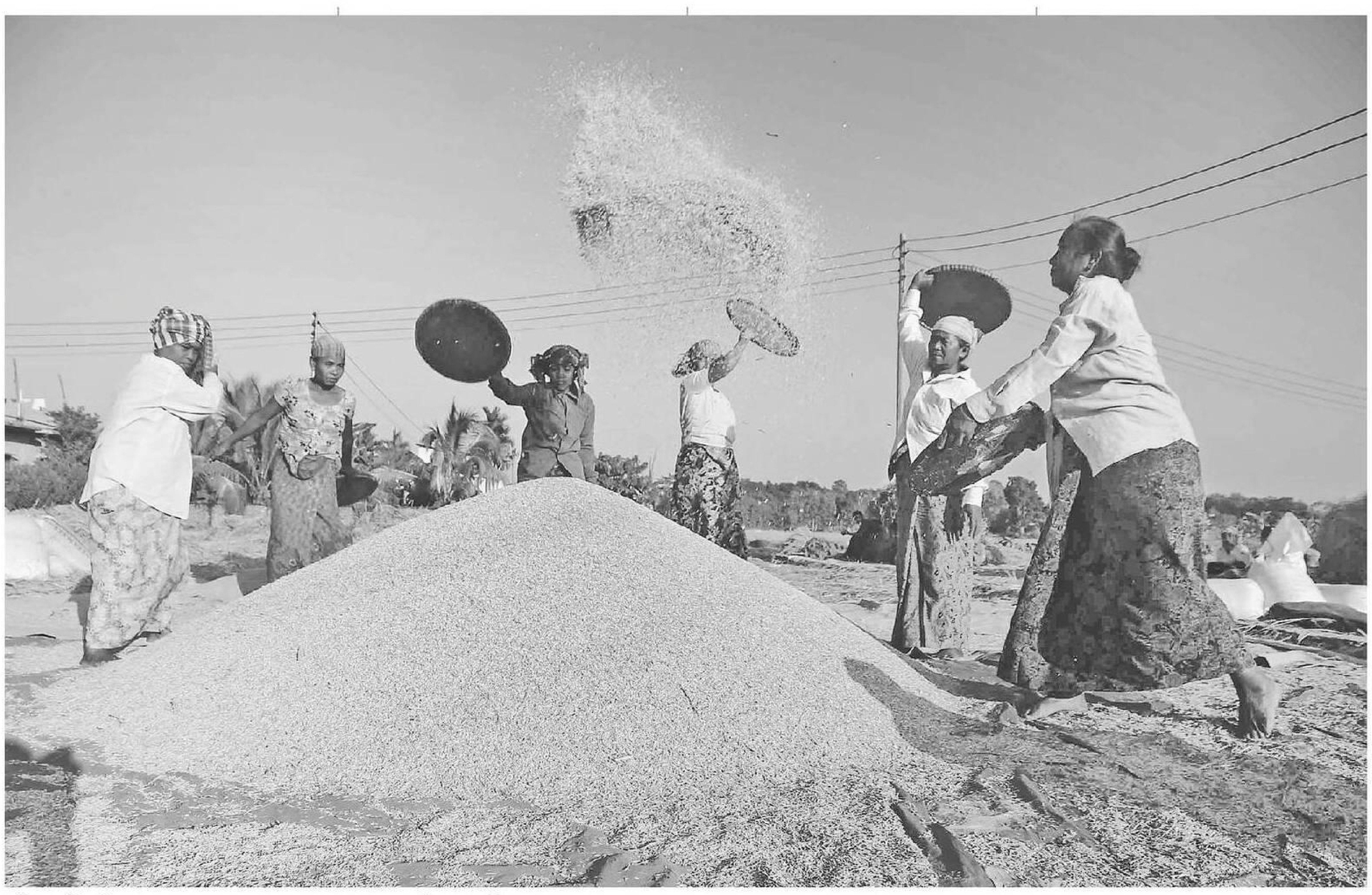

কৃষিতে নারী শ্রমিকেরা পুরুষের তুলনায় গড়ে ৩০ শতাংশ কম মজুরি পান। ছবি : প্রথম আলো

> বিশ্বব্যাংকের গবেষণা বলছে, যদি নারী শ্রমিকদের সমান সুযোগ ও সমান মজুরি দেওয়া যায়, তাহলে বাংলাদেশের জিডিপি ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

মজুরি ও ক্ষমতায়নের বৈষম্য

'সমান কাজের জন্য সমান মজুরি'—বাংলাদেশের শ্রম আইনে এই নীতিটি থাকলেও বাস্তবে বহুলাংশেই উপেক্ষিত। আইএলও ও ইউএন ওমেন-এর ২০২৪ সালের যৌথ রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নারী শ্রমিকেরা পুরুষদের তুলনায় ২১-৩২ শতাংশ কম আয় করেন, যদিও অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের উৎপাদনশীলতা বেশি।

এ ছাড়া দেশের ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলোতে নেতৃত্বস্থানীয় পদে নারীর উপস্থিতি মাত্র ৮-১০ শতাংশ। অর্থাৎ শ্রমনীতি বা দর-কষাকষির টেবিলে নারীর কণ্ঠ প্রায় অনুপস্থিত।

আইন ও প্রয়োগের ব্যবধান

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও বৈষম্যহীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছে। কিন্তু এগুলো বাস্তবায়নে ঘাটতি প্রকট। আইএলও কনভেনশন ১০০ (সমান মজুরি), ১১১ (বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ) এবং ১৯০ (সহিংসতা প্রতিরোধ) এখনো অনুস্বাক্ষর করা হয়নি। নারী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় এই কনভেনশনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থাও দুর্বল। বর্তমানে প্রতি ৭০ হাজার শ্রমিকের জন্য মাত্র একজন পরিদর্শক রয়েছেন (আইএলও, ২০২৩)। ফলে অধিকাংশ বৈষম্যই অনিরীক্ষিত থেকে যায়।

বৈষম্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব

বিশ্বব্যাংকের গবেষণা বলছে, যদি নারী শ্রমিকদের সমান সুযোগ ও সমান মজুরি দেওয়া যায়, তাহলে বাংলাদেশের জিডিপি ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। অন্যদিকে বৈষম্য ও অনিরাপদ কর্মপরিবেশের কারণে বছরে লাখ লাখ নারী শ্রমিক কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করেন, যা উৎপাদন ও দক্ষতা দুই ক্ষেত্রেই ক্ষতি করে। অর্থাৎ নারী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য শুধু ন্যায্যতার প্রশ্ন নয়, এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও একটি বড় প্রশ্ন।

সমতার জন্য যা করতে হবে

১. আইনের কার্যকর প্রয়োগ : শ্রম আইন অনুযায়ী মাতৃত্বকালীন ছুটি, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সমান মজুরিবিষয়ক বিধান বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
২. ডে-কেয়ার ও যত্ন সুবিধা : প্রতিটি বড় কর্মক্ষেত্রে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন বাধ্যতামূলক করতে হবে।
৩. নারী নেতৃত্ব ও ইউনিয়নে প্রতিনিধিত্ব : ইউনিয়ন ও শ্রম পর্ষদে অন্তত ৪০ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা উচিত।
৪. ব্র্যান্ড ও নিয়োগকর্তার দায়বদ্ধতা : আন্তর্জাতিক ক্রেতা ব্র্যান্ডগুলোকে নারী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় বাধ্যতামূলক 'হিউম্যান রাইটস ডিউ ডেলিজেন্স' চালু করতে হবে।
৫. সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন : নারীকে 'সহায়ক' নয়, 'সমান অংশীদার' হিসেবে দেখা জরুরি। গৃহস্থালি দায়িত্বে পুরুষদের অংশগ্রহণ বাড়াতে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

নারী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য শুধু নীতি বা আইনের ত্রুটি নয়, এটি সমাজের অন্তর্গত মানসিকতা ও কাঠামোর প্রতিচ্ছবি।

একজন নারী শ্রমিকের ঘাম যেমন দেশের রপ্তানিকে এগিয়ে নিচ্ছে, তেমনি তাঁর প্রতি বৈষম্য আমাদের মানবিক ও ন্যায্য সমাজ গঠনের পথে বড় বাধা। শুধু অর্থনৈতিক অবদানই নয়, নারীর শ্রম যেন মর্যাদা ও সমতার প্রতীকও হয়ে ওঠে। এই লক্ষ্যে পরিবর্তন আনার এখনই সময়।

নারীর লেন্সে সমাজটাকে দেখতে চাই

আজমেরী হক বাঁধন

অভিনয়শিল্পী

২০০৬ থেকে অভিনয় করছি। প্রচুর নাটকে কাজ করেছি। তারপর তো চলচ্চিত্রে এলাম। নাটক করতে করতে নাটকের অবস্থাটা বুঝেছি। তারপর যখন সিনেমা করতে শুরু করলাম, সিনেমার পরিস্থিতিটাও আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে। এত বছরের পেশাজীবনে যে উপলব্ধিটা হয়েছে, সেটা হলো বাংলাদেশে নারীপ্রধান গল্পে কাজ হয় খুবই কম। এই কম হওয়ার পেছনে ইন্ডাস্ট্রির কিছু গাফিলতি আছে। এখানে যাঁরা টাকা লগ্নি করেন, সেই মানুষগুলোর মনমানসিকতারও কিছু সমস্যা আছে।

দর্শক চান না, প্রযোজকও বানান না

সুপারস্টারের ওপর লগ্নি করলে টাকা ফেরত আসে। তাই পুরুষপ্রধান চরিত্রের সিনেমার ওপর প্রযোজকেরা বেশি টাকা লগ্নি করেন। দায়বদ্ধতার বিষয়টা তাঁরা মাথায় রাখেন না। তাঁরা কিন্তু এটা মনে করেন না যে তাঁদেরও সমাজের জন্য কিছু করার আছে। আমি এখানে প্রযোজকদের বেশি করে সামনে আনতে চাই। কারণ আমি মনে করি, বাংলাদেশে প্রচুর মেধাবী পরিচালক আছেন, প্রচুর অভিনেতা-অভিনেত্রী আছেন, যাঁরা ভালো কাজ করার জন্য, একটু ভিন্ন কিছু করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু প্রযোজক যাঁরা আছেন, তাঁরা টাকাটা লগ্নি করার জন্য প্রস্তুত নন। এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসাটা খুব জরুরি।

দর্শকেরও দায় আছে। নারীপ্রধান গল্পের সিনেমা দর্শক হলে গিয়ে দেখতে চান না। যে গল্পগুলো হচ্ছে, সেখানে কী ধরনের নারী চরিত্র আমরা দেখি? সেই নারী চরিত্রগুলোকেই দেখি, নারীদের যে রকম করে দেখতে চায় সমাজ। সমাজের ওই তথাকথিত নিয়মের মধ্যে পড়ে না, এ রকম নারীকে পর্দায় আমরা কিন্তু গ্রহণ করি না। *রেহানা মরিয়ম নূর* নিয়ে আমরা কান চলচ্চিত্র উৎসব ঘুরে এসেছি, এশিয়া প্যাসিফিক স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, জাতীয় পুরস্কার পেয়েছি, দর্শক কিন্তু এ রকম একটা নারী চরিত্রকে গ্রহণ করেননি। কিন্তু আপনি দেখবেন, একটা পুরুষ চরিত্র যখন সহিংসতা করে বা রাগী একটা চরিত্র করে, সেটা কিন্তু খুব সহজে গ্রহণ করা হয়।

সমাজে আমরা যেটা করি, সিনেমা তা-ই প্রতিফলিত করে। আসলে নারীপ্রধান গল্প বা একটু ভিন্নধর্মী কাজ, যেখানে নারী চরিত্রকে তথাকথিত নারীর মতো দেখানো হবে না, এ রকম চরিত্র খুব একটা সামনে আসে না। কিন্তু এ রকম অজস্র গল্প আছে, বাঁধ ভাঙার গল্প, যেগুলো মানুষ পর্যন্ত পৌঁছানো উচিত।

তারপরও নারীপ্রধান কিছু গল্প এখন হচ্ছে। যেমন *রেহানা মরিয়ম নূর*, *প্রিয় মালতী*, *বাড়ির নাম শাহানা*। এই সিনেমাগুলোর প্রতিটির কেন্দ্রেই কিন্তু খুব শক্তিশালী নারী। আমি যখন কাজ শুরু করেছিলাম, এ ধরনের সিনেমা তখন খুব একটা দেখিনি। সাহস করে পরিচালকেরা এ ধরনের সিনেমা করার জন্য এগিয়ে আসতেন না।

কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য

একজন পুরুষ শিল্পী অভিনয় করে যে টাকা পান, গুটিকয় নারী তাঁর কাছাকাছি পারিশ্রমিক পান। হাতে গোনা চার-পাঁচজন এ রকম আছেন। সিনেমাতে এই তফাত ভীষণভাবে আছে। নাটকে কোনো কোনো নারী অভিনয়শিল্পী আছেন, যাঁরা সমান সমান পারিশ্রমিক পাচ্ছেন। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটা ঘটে না।

কর্মক্ষেত্রটাও নারীর জন্য খুব প্রতিকূল। এমনিতেই মেয়েরা যখন বাসা থেকে বের হন, তখন থেকেই শুরু হয় তাঁর প্রতিকূল জীবন। ইন্ডাস্ট্রিতেও যে খুব নিরাপদ একটা পরিবেশে কাজ করি, এ রকম নয়। নির্যাতিত হওয়ার অনেক ঘটনাও এখানে আছে। অনেক এক্সপ্লয়েট হওয়ার ঘটনা আছে। ম্যানিপুলেট হওয়ার ঘটনা আছে। তা ছাড়া রাত হয়ে গেলে বাসাতেও ঝামেলা হয়। অনেক মেয়েকে দেখবেন, যাঁরা পোশাকে কাজ করেন, রূপসজ্জায় কাজ করেন, শিল্পনির্দেশনার কাজ করেন; তাঁদের কিন্তু বাসা থেকে ঝামেলা হয় শুধু রাত হয়ে যায় বলে। আমাদের শুটিংগুলো দেখা যায় রাত করে হচ্ছে, ওঁদের কিন্তু এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়। এভাবে তাঁদের কাজের ক্ষেত্রটা অনেক ছোট হয়ে যায়। হয়তো তাঁর প্রতিভা আছে, কিন্তু কাজটা তিনি চালিয়ে যেতে পারেন না। পরিবার ওভাবে সহায়তা করে না।

আবার একজন অভিনেত্রী যেভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রলের শিকার হন বা যেভাবে তাঁর কোনো একটা নিউজকে রগরগে করে হাইলাইট করা হয়, ছেলেদের ক্ষেত্রে সেটা হয় না। সেটাও কিন্তু কাজের ক্ষেত্রকে অনেক ছোট করে দেয়। আপনি হয়তো বলবেন, আপনাকেও তো অনেক ট্রল করে, আপনার তো কিছু হচ্ছে না। আমার কিছু হচ্ছে না কারণ, অভিজ্ঞতা। ট্রমার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আমি কিন্তু প্রতিরোধী হয়ে গেছি। আমার কাছে এগুলোকে এখন আর কিছু মনে হয় না। কিন্তু আমার বয়স যদি এখন ২০-২১ বছর হতো আর এইভাবে আমাকে ট্রল করা হতো, আমার নিউজগুলোকে যদি এ রকম রসালো করা হতো, আমার পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হতো।

আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে বয়স। বয়স হয়ে যাওয়ার পরও পুরুষেরা নায়ক হচ্ছেন, তাঁদের ওপর ভিত্তি করে গল্প হচ্ছে। তাঁদের কাজের ক্ষেত্রটা ছোট হয় না। কিন্তু মেয়েদের ৪০ হলেই কাজের ক্ষেত্রটা খুব ছোট হয়ে যায়। জয়া আহসানকে একটা বড় ব্যতিক্রম বলব। এই ট্রেন্ড তিনি ভাঙতে পেরেছেন। পরিশ্রম আর মেধা দিয়ে জায়গাটা তিনি তৈরি করেছেন। কিন্তু সেই পথ এত সহজ নয়। আমি চেষ্টা করছি।

কারণ, প্রযোজক, পরিচালকেরা আসলে এই বয়সের নারী চরিত্র নিয়ে কাজ করেন না। হলিউডে আপনি দেখবেন, ৬০-৬৫ বছর বয়সেও অস্কার পাচ্ছেন। তাঁদের ওপর ভিত্তি করে গল্প হচ্ছে। ফলে যত বয়স হচ্ছে, কাজের ক্ষেত্রটা তত বাড়ছে। সুযোগ বাড়ছে। চরিত্রের বৈচিত্র্য বাড়ছে। ভারতেও একই সমস্যা। তবে বলিউডেও নায়িকাদের নিয়ে কিছু কাজ এখন হচ্ছে। ইদানীং কাজল করছেন, কিন্তু সেটা খুবই কম। আর আমাদের এখানে নারী শিল্পীর সুযোগ ক্রমে সংকুচিত হয়ে যায়। কারণ, এখানে চলচ্চিত্র বা নাটকে নারী আসলে অলংকার। খুব বেশি কাজ করার জায়গা তাঁদের থাকে না।

বাণিজ্যসফল সিনেমাগুলোতে দেখবেন, তিনি নায়িকা ঠিকই, তবে তাঁর চরিত্রটা নিয়ে কাজ করার সুযোগ খুব একটা নেই। আরেকটা বিষয়ও আছে, সমাজও নারীকে খুব খারাপ হিসেবে দেখতে পছন্দ করে। নারীবিদ্বেষী গল্পগুলো আমাদের এখানে খুব হিট। এইটার খুবই সফল উদাহরণ *সুড়ঙ্গ* আর *পরান*। আমার মনে হয়েছে, এই সিনেমা দুটি সুপারহিট হওয়ার পেছনে অনেক বড় একটা কারণ, সমাজে যে নারীবিদ্বেষটা আছে, সেটা পর্দায়ও দেখানো হয়েছে। এটা ছবিগুলোর সাফল্যকে একধরনের ত্বরান্বিত করেছে।

এই জিনিসগুলো থেকে আমাদের পরিচালক, আমাদের প্রযোজক, আমাদের শিল্পীদের সচেতনভাবে বের হয়ে আসতে হবে। সমাজ পরিবর্তনে শিল্প ও শিল্পীর অনেক বড় ভূমিকা থাকে। সমাজের যে গতি, সমাজ যেদিকে যাচ্ছে বা সমাজ যা দেখতে চায়, শুধু সেই জিনিসগুলোকেই কি আমরা দেখাব?

কী করা দরকার

এখানে অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করতে পারেন প্রযোজক। বাংলাদেশে ভালো প্রযোজকের বড় অভাব। ইন্ডাস্ট্রিতে শিক্ষিত ও প্রগতিশীল প্রযোজক লাগবে। যাঁরা সমাজ পরিবর্তনের জন্য আসলেই কিছু করতে চান। এটাই প্রথম চাহিদা। প্রযোজক কি শুধু টাকা বানানোর জন্য এখানে আসছেন? কালোটাকা সাদা করার জন্য আসছেন? নাকি সমাজের জন্য কিছু করতে আসছেন? এগুলো তাঁর কাছে পরিষ্কার হতে হবে।

> বাংলাদেশে প্রচুর মেধাবী পরিচালক আছেন, প্রচুর অভিনয়শিল্পী আছেন। কিন্তু প্রযোজক যাঁরা আছেন, তাঁরা টাকাটা লগ্নি করার জন্য প্রস্তুত নন।

তারপর চাই পরিচালক, সেই সব পরিচালক, প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে সমাজটাকে যাঁরা দেখতে পারেন এবং মানুষকে সেটা দেখাতে চান। আমার সমাজ দেখতে চায় বা আমরা যেটাতে অভ্যস্ত, সেইটা দেখানোর অনেক লোক আছে। বাণিজ্যসফল পরিচালকদেরও গ্রুমিং দরকার, তাঁদেরকে বদলাতে হবে। ভারতের কথাই ধরুন। যশ রাজ ফিল্মস কিংবা করণ জোহরের ধর্ম প্রোডাকশনস কিন্তু ভীষণ রকম কমার্শিয়াল। কিন্তু আপনি দেখবেন, ওদের সিনেমাগুলোতে কিন্তু কোনো একটা সামাজিক বার্তা থাকে। এটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি বাণিজ্যসফল একটা সিনেমা বানাতে চান, তাহলে ওই পরিচালক বা ওই প্রযোজককে সমাজ নিয়ে চিন্তা করার সুযোগটা তৈরি করে দিতে হবে যে না, কিছু মেসেজ আমার সিনেমায় থাকবে এবং সেটা তাঁরা নিজে থেকেই করবেন। এ রকম না যে তাঁকে বাধ্য করা হবে, এই বোধ যাতে তাঁদের মধ্যে তৈরি হয়।

নারীপ্রধান গল্পের সিনেমা দর্শক হলে গিয়ে দেখতে চান না, তারপরও নারীপ্রধান কিছু গল্প এখন হচ্ছে। ছবি : *সাবার* পোস্টার

আমার যেমন মনে হয়, এখানে নারী পরিচালকের প্রচণ্ড অভাব আছে। সমাজটাকে মেয়েদের চোখে দেখা, মেয়েদের লেন্স দিয়ে দেখাটা কিন্তু খুব জরুরি। নারী নির্মাতা যাঁরা আছেন, তাঁদের বেশির ভাগই এই ব্যবস্থার মধ্যে বেড়ে ওঠা। সমাজটাকেও তাঁরা প্রচলিত দৃষ্টিতেই দেখেন। প্রচলিত ব্যবস্থায় বেড়ে উঠলেও এসব প্রথা ও প্রতিবন্ধকতাকে ভাঙতে পারেন বা অন্যভাবে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে পারেন, এ রকম নারী পরিচালক সমাজে খুব দরকার। আমি নারীর লেন্সে সমাজটাকে দেখতে চাই।

আবার অনেক পুরুষকেও চিনি, যাঁদের লেন্সেও সমাজটা অনেক আলাদা। আমাকে খুবই অবাক করেছে *সাবা*। যদিও এটা একটা পুরুষ পরিচালকের কাজ। পুরুষের চোখে একজন নারীকে দেখানো হয়েছে। সাবার চরিত্রটা আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় লেগেছে। আমার রেহানা চরিত্রটাও একজন পুরুষের কলমেই লেখা। তবে রেহানা চরিত্রটায় প্রচণ্ডভাবে আমার ব্যক্তিগত ইনপুট ছিল। সেইটা আমার মনে হয় চরিত্রটার মধ্যে একটা আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। তাই নারী-পুরুষ সবাইকেই এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুলিখিত

‘নারী লেখকের’ বেদনা

আফসানা বেগম

লেখক, পরিচালক,
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

‘নারী লেখকের’ সবচেয়ে বড় বেদনা এই যে তিনি ‘নারী লেখক’ই রয়ে গেলেন, ‘লেখক’ হয়ে উঠতে আর পারলেন না। পৃথিবীতে এখন থেকে অন্তত ৪ হাজার ২০০ বছর আগে একজন নারী লেখকের কথা জানা যায়—এনহেদুয়ান্না। মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অংশ ছিলেন তিনি; বর্তমানে যা দক্ষিণ ইরাক। সুমেরিয়ানদের লেখক এনহেদুয়ান্না প্রথম-পুরুষে রচনা করতেন। সেই প্রাচীন যুগের পথ ধরে কত নারী লেখক এলেন-গেলেন, কিন্তু কত কী লিখেও কেবল ‘নারী লেখক’ই বনে থাকলেন।

আচ্ছা, মিসরীয় সভ্যতায় দেয়ালে যে হায়ারোগ্লিফিক, তা কি কেবল পুরুষেরাই করেছিলেন? পুরুষেরাই কি কেবল আঁচড় কেটেছিলেন প্যাপিরাসের পাতায়? যাক তবু তো মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় এক নারীকে উল্লেখ করা হয়েছে! কী যে বেদনা, কী যে বেদনা...সাহিত্যজগতে ‘লেখক’ বলে মানে না, ওদিকে সংসারের লোকেরা সে রকম সাদাসিধা ‘গৃহিণী’ বলে মানে না। গৃহে থাকলেই যে ‘গৃহিণী’ হয় না—তার এত বিষয়ে জানতে হবে কেন? এত পড়াশোনাই-বা কিসের! আর কথা নেই বার্তা নেই নিঝুম রাতে লিখতে বসে যাবে?

কিন্তু নারীটি জানেন, সংসারের সব কাজ গুছিয়ে, শিশুটিকে শান্ত করে, বৃদ্ধের সেবা করে, সঙ্গীর মনোরঞ্জন করে, তারপরেই না তাঁকে লিখতে বসতে হবে! আর লিখতে বসলে, লেখা বড় মহৎ কর্ম—এই ভেবে কেউ তাঁর টেবিলে এক কাপ চা পৌঁছে দেবে না। লেখার চাপ আছে জেনে কেউ গরম ভাত টেবিলে দিয়ে ডাকতে আসবে না। কারণ, লেখা তো কোনো কাজই না—বিশেষ করে নারী যখন সেটা করেন। নারীকে প্রকৃতি, পরিবার আর সমাজ এত এত দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছে যে সেই সবকিছু থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি যে লিখতে বসবেন—এ এক সংগ্রাম বটে। আশাপূর্ণা দেবী কিংবা মহাশ্বেতা দেবী বা আরও অনেকে সে সংগ্রামের চিহ্ন রেখে গেছেন। বাস্তবে শুধু সন্তান পালনই একটা সম্পূর্ণ জীবনের কাজ হতে পারে। কদিন আগে মুম্বাইয়ের অভিনয়শিল্পী রানী মুখার্জি বলছিলেন, ‘প্রাকৃতিকভাবে পুরুষকেও সন্তান ধারণ করতে হলে পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ থাকত না।’ বাস্তবে পরিবার আর সন্তানের প্রতি সমাজ-নির্দেশিত দায়ভারটি কেবল নারীর। সমাজ তাঁকে সুনির্দিষ্ট লৈঙ্গিক ভূমিকায় দেখতে চায়। তাই তো খোদ ব্রিটেনে শার্লট ব্রন্টিকে উনিশ শতকে লর্ড চার্লস অ্যালবার্ট বা কারার বেল ছদ্মনামে উপন্যাস লিখতে হয়েছিল। পরে তাঁর সত্যিকার পরিচয় জেনে পাঠকেরা বলেছিলেন, ‘এই লেখক মেয়ে? কেমন মেয়ে রে, বাবা!’

মাত্র ২০ শতাংশ নারী

কিশোরদের খেলায় যেমন কেউ থাকে ‘দুধভাত’, সাহিত্যজগতে নারীকে তেমন প্রায়ই ‘দুধভাত’ ধরে নেওয়া হয়—আচ্ছা লিখছে লিখুক, বেশ কোমল রচনা হবে। লিখতে যখন চেয়েছেন, তেমন ধারালো কিছু তো হবে না, হবে ‘মেয়েলি’ ধরনের; তাতে খুব প্রেম থাকবে, রোমান্স থাকবে। কবিতা লেখে নিশ্চয়! প্রেমের কবিতা—হতাশা বা ব্যর্থতার। নারীর লেখার বিষয়বস্তু এমনই—এ ধারণা থেকে নির্ধারণ করা হয় তাঁদের লেখাপড়ারও তেমন প্রয়োজন নেই। বরং পুরুষের লেখায় ‘অ্যাকশন’ আছে, সংগ্রাম আর যুদ্ধ আছে, কড়া রচনা না পড়ে কি প্যানপ্যানানি কেউ পড়তে চায়? আবার যে লেখাকে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাবে না তা বোদ্ধা পাঠকেরা হাতে নেবেনই-বা কেন। এভাবে ধরেই নেওয়া হয় নারীর লেখায় গঠনমূলক কিছু থাকবে না, বিস্মিত হওয়ার মতো কিছু থাকবে না। বিশ্বজুড়ে তাই নারীর বই প্রকাশ কম, পাঠকও কম। অক্সফোর্ডের এক গবেষণায় দেখা যায়, সারা বিশ্বে প্রকাশিত বইয়ের মাত্র ২৮ শতাংশ নারীর লেখা। বাংলাদেশের একুশে বইমেলায় প্রকাশিত বইয়ের মাত্র ২০ শতাংশের লেখক নারী। নারীর লেখাকে কোনো বিশেষ ধারায় ফেলার কোনো সুযোগ নেই, যেখানে কিনা পাঠক জানেন রহস্য থ্রিলারের বই পড়তে তাঁকে আগাথা ক্রিস্টির কাছে যেতে হবে। ওদিকে নাদিন গর্ডিমার, টনি মরিসন, অরুন্ধতী রায় লিখেছেন তুমুল রাজনৈতিক রচনা। বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনগুলো নিয়ে রিজিয়া রহমান, সেলিনা হোসেন আর শাহীন আখতার লিখেছেন। এখনকার সাহিত্যিকদের মধ্যে নারীরাই অনেক ক্ষেত্রে সমাজের অসংগতিগুলো বেশি করে তুলে ধরছেন। তাই নারীর রচনাকে পেলব ভাবার কোনো কারণ নেই। তবু কৌতূহলের বিষয়, এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, পৃথিবীময় সাড়া-জাগানো কিশোর থ্রিলার ও জাদুবাস্তবতার গল্প ‘হ্যারি পটার’ লিখে প্রকাশের সময়ে জোয়ান রোলিংকে পুরুষ-আধিপত্যময় সাহিত্য সমাজে প্রচার ও প্রসার পাওয়ার লক্ষ্যে লেখক নাম ‘জে কে রোলিং’ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

অন্যদিকে সমাজের বড় অংশ ভাবে, নারী নিশ্চয় কেবল নারীবাদ নিয়ে লেখেন; সোজা কথা তাঁর লেখা নারীবাদদুষ্ট। সেখানে নারীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকবে, থাকবে পুরুষবিদ্বেষও। তাই ও রকম লেখা না পড়াই শ্রেয়। উনিশ শতকের শুরুতে নারীবাদের ঢেউ শুরু হওয়ার সময়ও তা নিয়ে এত ভ্রান্ত ধারণা আর বিদ্বেষ ছিল না, যতটা আজ চতুর্থ ঢেউয়ের সময়ে দেখা যাচ্ছে। নারী আর তাঁর বিকাশের বিপক্ষে যেন সারা পৃথিবী দাঁড়িয়ে গেছে। শুধু সাহিত্যজগতে কেন, কোন পেশায় নিরাপদ থাকেন বা নির্দ্বিধায় সম্মানিত হন নারী?

> মননশীল কাজের ধরন হলো এতে একাগ্রতার প্রয়োজন। নারী কোনো কাজে বেশি ডুবে গেছে মানেই পরিবারের সমস্যা, সমাজেরও সন্দেহ।

ঘরে সমস্যা, বাইরেও সমস্যা

তবে ‘নারী লেখক’দের বেদনা একটু বিশেষ বৈকি। মননশীল কাজের ধরন হলো এতে একাগ্রতার প্রয়োজন। নারী কোনো কাজে বেশি ডুবে গেছেন মানেই পরিবারের সমস্যা, সমাজেরও সন্দেহ। সাংসারিক কাজে অবহেলা করছেন—এ রকম তকমা তখন তাঁর চিরসঙ্গী। সাহিত্য রচনার নামে বাইরের জগতের সঙ্গে ঘোর সখ্য তখন সমাজের অভিযোগের দুয়ার খুলে দেয়—কী এমন লিখছে, যে এত লোকে চেনে! লেখার মাধ্যমে পুরুষ যখন প্রসার পান তখন সেটা তাঁর লেখার ক্যারিশমা, আর নারীর পরিচিতি পাওয়া মানে নারী তাঁর ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য, ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ দেওয়ার প্রবণতা, সর্বোপরি নারী হওয়ার ফায়দা নিচ্ছেন। সাহিত্য একটি সমগ্র বিষয়—একটি নির্দিষ্ট সময়কে সেই সুনির্দিষ্ট সময়ের সাহিত্যিকেরা তুলে ধরেন পরবর্তী প্রজন্মের পাঠযোগ্য করে। তাই সমসাময়িক লেখকদের আন্তযোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষে পুরুষে আড্ডা দিলে সেটা আড্ডাই, কিন্তু নারী উপস্থিত হলে তা হয়ে যায় প্রেম। সম্পাদক, প্রকাশকের ঘরে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে দিনের পর দিন আসতে পারেন পুরুষ লেখক, কিন্তু নারী লেখক এলেই সেটা চিন্তার কথা।

‘নারী লেখক’-এর হতাশা

এসব অযাচিত সামাজিক আগ্রাসন লেখক হিসেবে নারীকে হতাশায় ভোগায়। সমাজের বাঁকা চোখ তাঁকে পদে পদে বিপত্তিতে ফেলে। এই সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে একদিন তিনি তাঁর স্বাভাবিক গতিবিধির ওপরে নিয়ন্ত্রণ আনেন। তাঁর স্বাধীন গোপন সত্তা থাকে কেবল তাঁর মনে, যা তিনি কাগজ-কলম ছাড়া আর কারও সামনে উন্মুক্ত করতে পারেন না। এভাবে ‘নারী লেখকের’ জীবনে তাঁর বাস্তব সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় সাহিত্যের মেন্টর, সমসাময়িক সাহিত্যিক, এমনকি বন্ধু-পরিবারের সঙ্গে মানসিক বিচ্ছিন্নতা। পারিবারিক ও সামাজিক সহায়তার অভাব, এমনকি বাধার উপস্থিতিতে তাঁর নিজেকে গুটিয়ে নিতে হয়। গুটিয়ে নিতে নিতে একদিন তিনি দেখেন তাঁর কাছেধারে কেউ নেই। সাহিত্যের প্রতি একাগ্র ও নিবেদিতপ্রাণ লেখক নারী হলে এভাবে ধীরে ধীরে তিনি হয়ে পড়েন একা। সমাজ নিয়ে বিশ্লেষণ করেন ঠিকই; কিন্তু নিজেই যেন এক সমাজবিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করেন।

সমাজে গ্রহণযোগ্যতা কম বলেই হয়তো তাঁকে লেখার খাতায় প্রতিবাদ করতে হয় বেশি। বিশ শতকের প্রথম দিকে ভার্জিনিয়া উলফ বলে গিয়েছিলেন, ‘কল্পসাহিত্য লিখতে হলে নারীর নিজের থাকার জায়গা আর চলার মতো অর্থ থাকতে হবে।’ তারপরে প্রায় এক শতাব্দী চলে গেলেও সমাজ পরিবর্তন হয়নি তেমন। অনেক ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশি কূপমণ্ডূকতায় নিমজ্জিত হয়েছে। আজও সমাজ নারীকে নিজের মতো করে বাঁচতে দেওয়ার যোগ্য উদারতা দেখায়নি। নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক আর সংসারের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে পরমুখাপেক্ষী করে রাখাই সামাজিক রীতি। তাই আজও নারী লেখকের নিজের আয়ের নিশ্চয়তা আসে না, নিজের মতো করে বাঁচার ভাবনাও অনেক ক্ষেত্রে অবান্তর। বিশ শতকের শুরুতে বেগম রোকেয়া *সুলতানার স্বপ্ন* নামে যে ইউটোপিয়ান বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি লিখেছিলেন, সেই সাহসও পরবর্তী অনেক বছরে নারী সাহিত্যিকেরা দেখাতে পারেননি। তবে পথিকৃৎ আছেন বলেই হয়তো এই সবকিছুর মধ্যেও নারীর সাহিত্যের অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে, কখনো থামেনি, এটাই ভরসা।

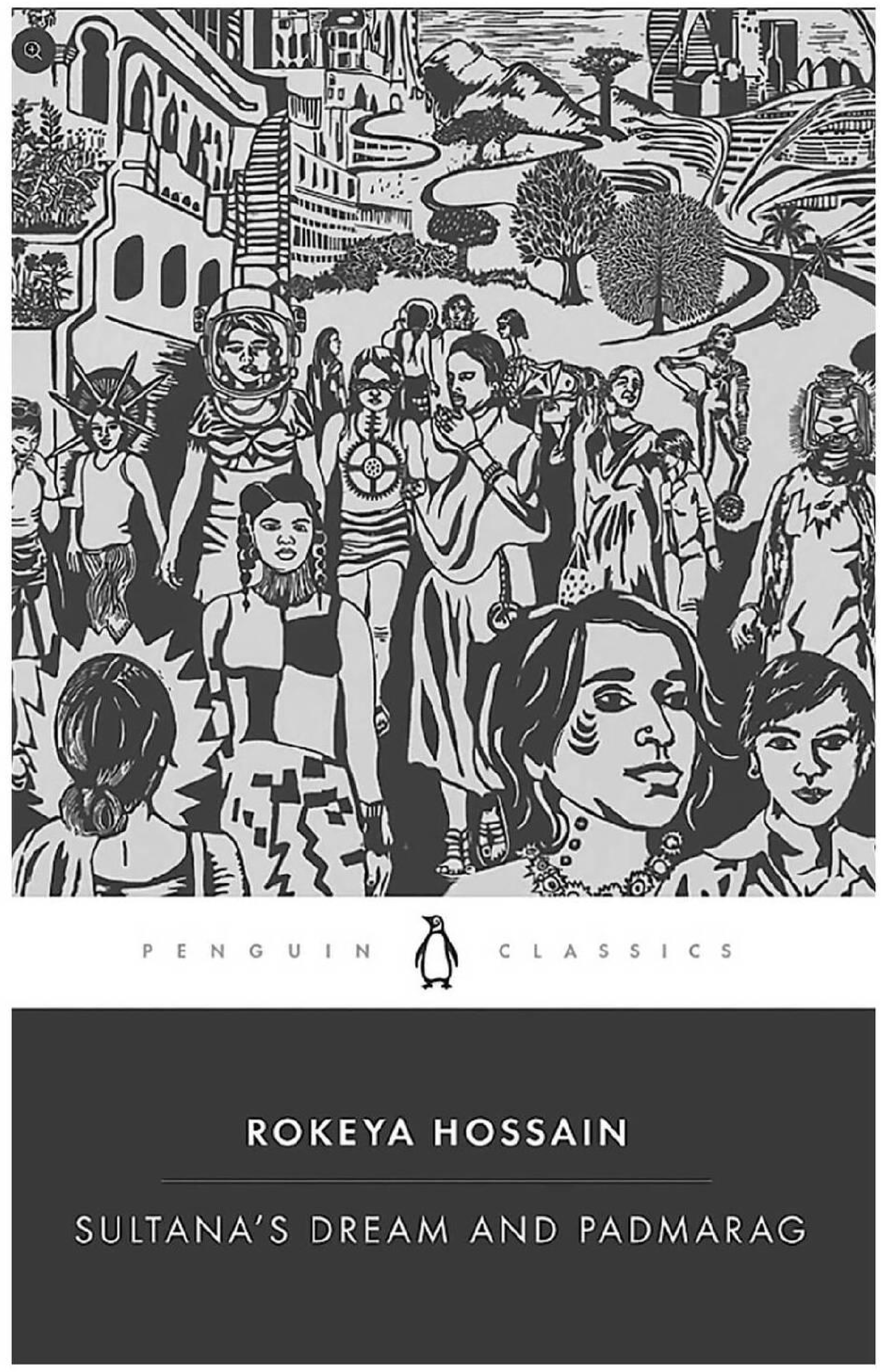

সুলতানাজ ড্রিম-এ যে সাহস বেগম রোকেয়া দেখিয়েছিলেন, সেই সাহস পরে অনেক বছর নারী সাহিত্যিকেরা দেখাতে পারেননি। ছবি : পেঙ্গুইন প্রকাশিত *সুলতানাজ ড্রিম* ও *পদ্মরাগ*-এর প্রচ্ছদ

গ্রন্থনীতি কেন অত্যাবশ্যক

মাহ্‌রুখ মহিউদ্দিন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দ্য
ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

রাষ্ট্র হিসেবে ৫৪ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও খুব প্রাথমিক কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা এখনো হচ্ছি। এসব বিষয় সুরাহা হয়ে যাওয়ার কথা ছিল আরও অনেক আগেই। কিন্তু রাষ্ট্র গঠনের দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, কিংবা জ্ঞানতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক জগতেও যে বুদ্ধিজীবীদের বাংলাদেশ পেয়েছে, তাঁদের বড় অংশই যাঁর যাঁর আদর্শিক ঘরানায় বিচরণ করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন—ভিন্নচিন্তার জগৎগুলোর মধ্যে আদান-প্রদান প্রায় হয়নি। এরই অনিবার্য পরিণতিতে ২০২৪ গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে আবারও আমরা জাতিগত আত্মপরিচয়ের কিছু টানাপোড়েন—আমরা কতটা বাঙালি, কতটা মুসলমান; কারা নমস্য, কারা ত্যাজ্য; কাদের নাম মুখে আনা বারণ ইত্যাদির মুখোমুখি নিজেদের দেখতে পাচ্ছি। এই বুদ্ধিবৃত্তিক লেনদেনের অভাবের পরিণাম হলো পরস্পরকে পরিত্যাজ্য করার একটি জাতীয় সংস্কৃতি।

সামনের দিনগুলো কতটা বিপৎসংকুল, তা নিয়ে নানাজনের নানান ভাবনা আছে। কিন্তু ‘বিপদ’গুলো কী প্রকার ও কী কী, তার একটা বিশ্লেষণ করলে এমন একটা ভাবনায় আসা যেতে পারে যে আমরা জাতিগতভাবে নিজেদের পরিচয় বিষয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। পূর্বসূরিদের ভাবনার সূত্র ধরে আত্মমর্যাদা নিয়ে কী পরিচয়ে আমরা বিশ্বের সামনে আবির্ভূত হতে চাই, সেই বিষয়ে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। কোনো রাষ্ট্রীয় কমিশন গঠন করে এ ঘটনা ঘটানো সম্ভবও নয়।

যা সম্ভব, তা হলো আমাদের ভূখণ্ডের ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা গভীরভাবে আত্মস্থ করে, পাঠ করে, যে ঐতিহাসিক ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি আমরা চাই না, সেগুলো চিহ্নিত করে, ইতিহাসের ক্রান্তিকালে মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে চিহ্নিত করে তার ভিত্তিতে নিজেদের প্রশ্ন করা, আর কিছু গভীর ট্রমা ও দ্বন্দ্বের ফয়সালা করা। আমরা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের কথা বলি; কিন্তু কী অর্থ এই নীতিগুলোর? তার স্বরূপ আজকের জন্য সংজ্ঞায়িত করতে হলে পেছন ফিরে তাকিয়ে আমাদের আত্মপরিচয় গঠনের যাত্রাকে আগে বুঝতে হবে সততার সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে।

এই প্রক্রিয়াকে জোরদারভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে যে কটি হাতিয়ার অপরিহার্যভাবে দরকার, তার মধ্যে জরুরিতম হলো মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নির্মোহ ও নির্ভেজাল জ্ঞানচর্চার পরিবেশ আর স্থানীয় ও বৈশ্বিক জ্ঞানের ভান্ডারকে মানুষের নাগালের মধ্যে আনার বন্দোবস্ত।

একটা বিষয় স্পষ্ট, যে দেশগুলো তাদের জাতি গঠনের কাজে ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে এগিয়েছে, তারাই আজ বিশ্বে স্বীয় মর্যাদায় আসীন। এশিয়া মহাদেশেই জাপান, চীন, ইরান, তুরস্ক, কাতার, ভারত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়ার দিকে তাকালে আমরা এমন উজ্জ্বল প্রয়াস পাই। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নানান বিষয়ে জ্ঞানচর্চাকে প্রধানতম হাতিয়ার হিসেবে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে ৫-৬ দশকে তারা এখন শিক্ষা, উদ্ভাবন, অর্থনীতি—সব ক্ষেত্রেই নিজেদের নেতৃত্ব বা মর্যাদার জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছে, বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি করেছে এবং নিজের দেশের মেধাবী ছেলেমেয়েদের জন্য দেশেই কর্মসংস্থান দিতে পেরেছে।

যে বিষয়গুলো এসব দেশে আমরা দেখি, তার মধ্যে অন্যতম হলো—

১. সবাই এরা শিক্ষা এবং উদ্ভাবনের ইকোসিস্টেম তৈরিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছে।
২. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় ধারাবাহিকভাবে সংগতি রক্ষা করে এগিয়েছে।
৩. ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা, দর্শন, ধর্মচর্চা, ভাষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক জ্ঞান ও পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্দ করেছে, যত্নের সঙ্গে সেগুলোর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বিনিয়োগ করেছে।

বাংলাদেশে আমরা দেখছি, শিক্ষা খাতে চলতি বছরের বাজেট বরাদ্দ জিডিপির ২ দশমিক ১ শতাংশ (২০২৪-২৫ অর্থবছরে যা ছিল ১ দশমিক ৭৬ শতাংশ)। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও এই হার আন্তর্জাতিক মানের নিচে, ইউনেসকো প্রস্তাবিত মানেরও (জিডিপির ৪-৬ শতাংশ) অনেক নিচে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ মোট বাজেটের শূন্য দশমিক ১ শতাংশ! এই বেদনাদায়ক বাজেট আর বরাদ্দের ক্ষেত্রে যেসব চর্চা ও আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বহাল আছে, তাতে আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের ইকোসিস্টেমকে মাটিতে পুঁতে ফেলার ভাবনাই প্রকট।

সমাজ পুনর্গঠনে বই ও কার্যকর গ্রন্থনীতি

একটি সৃজনশীল বা জ্ঞানভিত্তিক বই একজন নাগরিককে উৎকৃষ্ট মানবসম্পদে রূপান্তরিত করার এবং মনন তৈরির হাতিয়ার, শিক্ষার অপরিহার্য উপকরণ, এর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী, একই সঙ্গে এটি একটি মেধাসম্পদ ও অর্থনৈতিক পণ্য, যা তৈরিতেও ব্যবহৃত হয় নানা ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও কায়িক শ্রম। সৃজনশীল ও জ্ঞানভিত্তিক প্রকাশনা যাঁরা করেন, তাঁদের প্রায় সবাই ব্যবসায়িক লাভের আশায় নয়, একরকম প্রাণের তাগিদে, সমাজে কিছু অবদান রাখার তাগিদে এই পেশায় যুক্ত হন। এসব কারণেই একটি রাষ্ট্র যদি সত্যিকারভাবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণে আগ্রহী থাকে, তাহলে তার ওপর দায়িত্ব বর্তায় অত্যন্ত সহায়ক ও শক্তিশালী নীতির মাধ্যমে পাঠককে সহায়তা করার পাশাপাশি সৃজনশীল ও জ্ঞানভিত্তিক প্রকাশনাকে উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া, এই খাতের পেশাদারত্বের দিকে নজর দেওয়া। শক্তিশালী নীতিকে কাজে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, যার রূপরেখা খসড়া গ্রন্থনীতিতে বিস্তারিতভাবে আছে।

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থ পরিষদ গঠন

২০১৪ সালে প্রণীত জাতীয় গ্রন্থনীতির খসড়ায়, কোনো দিন যা সংসদে আলোচিত বা গৃহীত হয়নি, ইউনেসকোর প্রস্তাবের আলোকে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে পুনর্গঠন করে বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপদান করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আজকের বাস্তবতায় বিবেচনা করলেও এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা পরিষ্কার। আগেই যেমন বলা হয়েছে, পণ্য হিসেবে গ্রন্থ যেমন জটিল, এর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বও নানামুখী। গ্রন্থ খাতকে তাই কাজ করতে হয় অনেকগুলো মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে। বই একই সঙ্গে পণ্য, শিক্ষা উপকরণ, সাংস্কৃতিক উপকরণ; আবার বৈশ্বিক পরিসরে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতাও এর রয়েছে। তাই স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদায় কাজ করার সুযোগ করে দিলে গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে নিয়ে স্বাধীনভাবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণের এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রণোদনা পাবে।

জাতীয় গ্রন্থ পরিষদ তার কর্মপরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। আন্তমন্ত্রণালয় যোগাযোগগুলোও প্রয়োজনমতো এগিয়ে নিতে পারবে। এই পরিষদের বাজেট এবং কীভাবে এই প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির আওতায় রাখা হবে, সেই রূপরেখা গঠন করাও খুব কঠিন কাজ হবে না। সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে, এমন স্বায়ত্তশাসিত গ্রন্থ পরিষদের নজির ভারত, সিঙ্গাপুর, মিসর, নাইজেরিয়া ও ফিলিপাইনে আছে।

সমাজ বা রাষ্ট্রের মধ্যে বহু চিন্তা, ধর্ম, জাতি ও সংস্কৃতির মানুষকে আমরা যতটা যত্নের সঙ্গে লালন করব, আর্থসামাজিক অবস্থাননির্বিশেষে তাদের কাছে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোকবর্তিকা পৌঁছে দেব, ততটাই জ্ঞানভিত্তিক হিসেবে গড়ে উঠবে সেই সমাজ বা রাষ্ট্র।

বাংলাদেশের নানান সময়ের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকারেও কখনো কখনো ‘জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণ’-এর বুলিসর্বস্ব প্রতিশ্রুতি দেখা গেছে, কিন্তু কার্যত তার প্রতিফলন ঘটতে আমরা দেখিনি। শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে একের পর এক, এখনো এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থা আমরা প্রণয়ন করতে পারিনি, যাকে বলা যায় গণমুখী, বৈষম্যহীন এবং দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ তৈরির জন্য উপযুক্ত একটি ব্যবস্থা। সংস্কৃতি ও শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেট বরাদ্দের পরিস্থিতি দেখলেই মনে হয় যে লেখক, গবেষক, প্রকাশক, গায়ক, শিল্পী, আঁকিয়ে, চলচ্চিত্র নির্মাতা, থিয়েটারকর্মী—এঁদের সবাইকে রাষ্ট্র একরকম দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে গণ্য করে।

অথচ জাতির আত্মপরিচয় ও স্বকীয়তা নির্মাণে এই গোষ্ঠীর অবদান ও প্রভাব সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। আমাদের হৃত আত্মপরিচয় ও ঐতিহাসিক মর্যাদা পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষার মেলবন্ধন ঘটানোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চার ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য প্রয়োজন দূরদর্শী একটি গ্রন্থনীতি, মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও পেশাদার প্রকাশক গোষ্ঠী, যাদের একাংশ অবশ্যই জ্ঞানভিত্তিক বই নির্মাণে নেতৃত্ব দেবে।

SHANTO-MARIAM UNIVERSITY OF CREATIVE TECHNOLOGY

Providing Quality Education at an Affordable Tuition Fee

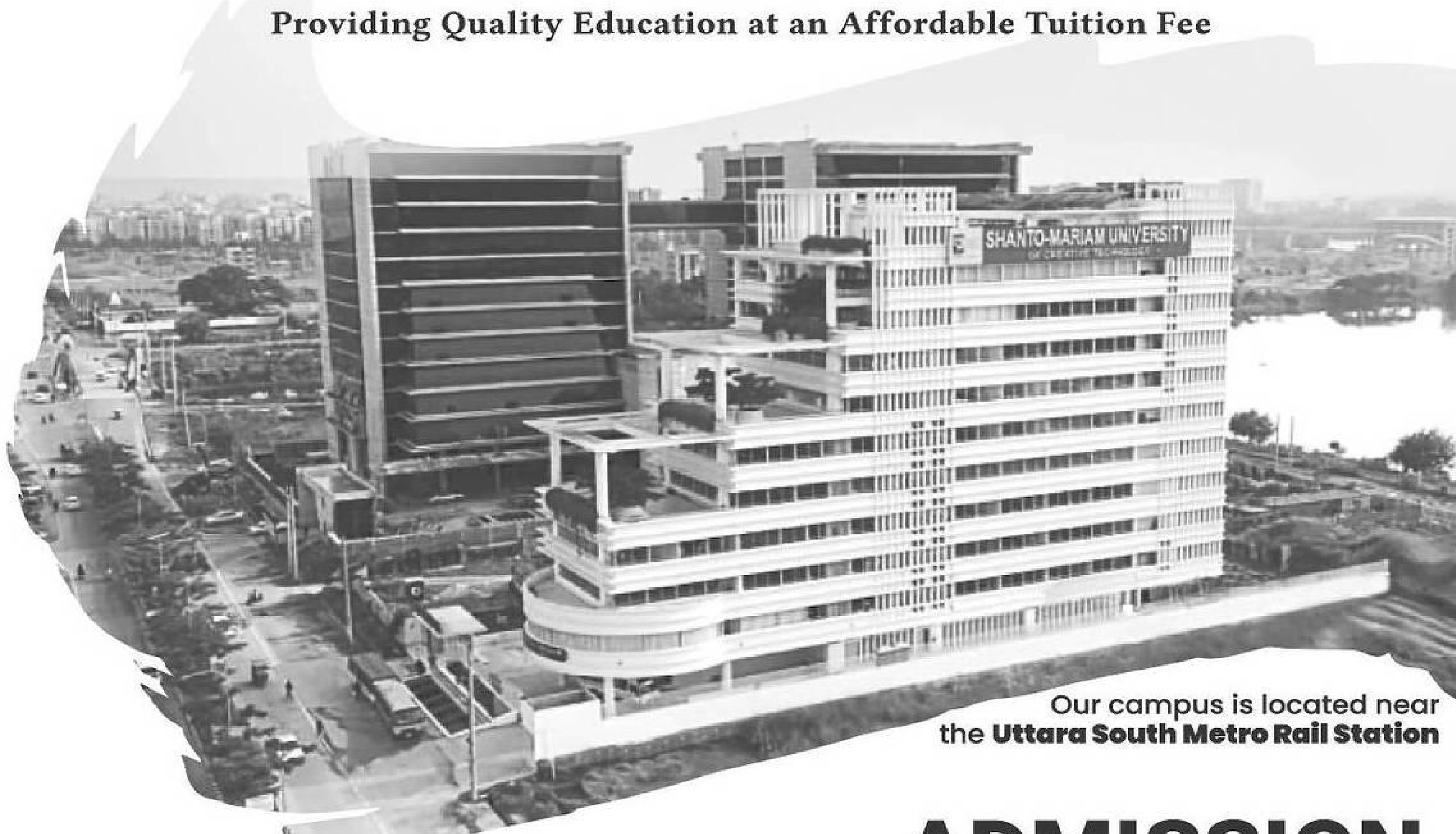

Our campus is located near the **Uttara South Metro Rail Station**

ADMISSION OPEN

50% WAIVER ON ADMISSION FEE

Up to 100% SCHOLARSHIP & WAIVER

Undergraduate Programs

Faculty of Design & Technology
- BA (Hons) in Fashion Design & Technology
- BA (Hons) in Graphic Design & Multimedia
- BA (Hons) in Apparel Manufacturing Management & Technology
- Bachelor of Architecture
- BA (Hons) in Interior Architecture

Faculty of Engineering & Technology
- BSc (Hons) in Computer Science & Engineering
- BSc (Hons) in Computer Science & Information Technology

Faculty of Business
- Bachelor of Business Administration (BBA)

Faculty of Humanities & Social Sciences
- BA (Hons) in Bangla
- Bachelor of Laws (LLB)
- BA (Hons) in Islamic Studies
- BSS (Hons) in Government & Politics
- BSS (Hons) in Sociology & Anthropology
- BA (Hons) in English (Language & Literature)

Faculty of Fine & Performing Arts
- B Music (Hons) in Dance
- B Fine Arts (Hons) in Drawing & Painting
- B Music (Hons) in Classical, Nazrul & Rabindra Sangeet

Postgraduate Programs

Faculty of Design & Technology
- MA in Fashion Design
- MA in Graphic Design & Multimedia
- MBA in Product & Fashion Merchandizing
- MA in Interior Design

Faculty of Business
- Master of Business Administration (MBA)

Faculty of Humanities & Social Sciences
- MA in Bangla
- MA in English
- MA in Islamic Studies
- Master of Laws (LLM)
- MSS in Government & Politics
- MSS in Sociology & Anthropology

Faculty of Fine & Performing Arts
- Master in Music (Dance)
- Master in Fine Arts (Drawing & Painting)
- Master in Music (Classical, Nazrul & Rabindra Sangeet)

For admission in FDT, GDM, Fine Arts, Dance & Music minimum requirement in both SSC & HSC is GPA 2.00

09638-177177
www.smuct.ac.bd
facebook.com/shantomariamuniversity

বয়স্কমাত্রই উপেক্ষিত

দিলরুবা কবির
প্রতিষ্ঠাতা,
শৈলান প্রবীণনিবাস

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায়ই কিছু নাটকের অংশবিশেষ চোখে পড়ে, যেখানে বৃদ্ধ বাবা-মাকে উটকো উপদ্রব মনে করে সন্তান বা তার জীবনসঙ্গী; নানাভাবে তাদের নিগ্রহ করে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের শেষ পরিণতি হয় বৃদ্ধাশ্রম।

নাটকের দৃশ্য হলেও এগুলো সমাজেরই বাস্তব ছবি। আসলে একদিকে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে, অন্যদিকে বন্ধ হয়ে গেছে বা কমে গেছে বয়স্কদের আয়। অথচ বেড়ে গেছে তাঁদের বিবিধ খরচ, বিশেষ করে চিকিৎসা ব্যয়। পাশাপাশি কমছে পারিবারিক বন্ধনের দৃঢ়তা, দেখা দিয়েছে মূল্যবোধের অবক্ষয়। সব মিলিয়ে নানা শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সময় পার করছেন প্রবীণেরা।

'ফ্রন্টিয়ার্স ইন পাবলিক হেলথ'-এর এক গবেষণা সমীক্ষা বলছে, বাংলাদেশে ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী জনসংখ্যা ২০১৫ সালে ৭ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ৯ দশমিক ৫ শতাংশ হয়েছে। ১৯৯০ সালে আয়ু ৫৭ দশমিক ৫ থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ৭২ দশমিক ৩ হয়েছে। বয়সীদের আনুপাতিক হারও বাড়ছে। ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে প্রতি ১০ জনের একজন হবেন প্রবীণ, ২০৫০ সালে এই সংখ্যা হবে ৫ জনে ১ জন। বয়স্ক জনসংখ্যার প্রভাব স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শ্রমবাজার, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, অবসরভাতার ওপর পড়বে। প্রবীণেরা গড়ে দরিদ্রতমদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র। প্রবীণদের এই বর্ধিত সংখ্যার জন্য বাংলাদেশের আরও সহায়তার প্রয়োজন হবে।

বেশির ভাগ বয়স্ক মানুষ গ্রামাঞ্চলে বাস করেন। সেখানে স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনৈতিক পরিষেবা এবং কাজের সুযোগ কম। ক্রমবর্ধমান বয়স্কদের জন্য পর্যাপ্ত যত্ন এবং সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশ একটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে বিবাহবিচ্ছেদের হার নাটকীয়ভাবে বাড়ছে, এটি 'একাকী' প্রবীণ জনসংখ্যার বৃদ্ধি করবে। অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ৯৫ শতাংশ বয়স্ক ব্যক্তির বেশির ভাগই একাধিক স্বাস্থ্যজটিলতায় ভোগেন; যা দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ।

একটি কেস স্টাডি

আমার মধ্যচল্লিশে, ছেলে-মেয়ে যখন বাইরে পড়তে গেল, হঠাৎ মনে হলো, যদি কখনো ওরা ফিরে না আসে! এমন এক সামাজিক পরিমণ্ডলে আমি বড় হয়েছি, যেখানে ছেলেমেয়েরা বয়স্ক মা-বাবার সঙ্গে থাকে। কিন্তু বর্তমানে পারিবারিক ব্যবস্থা দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। জীবনমান উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, কাজ ও বৈবাহিক কারণে অনেকে গ্রাম থেকে শহরে, দেশ থেকে দেশের বাইরে আবাস গড়ে তুলছে। এসব চিন্তা থেকেই মনে হলো আমার ছেলেমেয়েরাও সেখানে স্থায়ী হয়ে গেলে আমাদের ভবিষ্যৎটা কেমন হবে! উন্নত দেশে এ ধরনের লোক, বিশেষ করে গরিবদের জন্য অনেক কমিউনিটি রয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানে তো তেমন কিছুই নেই।

তাই যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে একবার মেয়েকে তার বিশ্ববিদ্যালয়ে নামিয়ে দিয়ে বোস্টনের কাছে ব্রুকলিনের একটা 'গডার্ড হোম' (বয়স্কদের আবাস) দেখতে যাই। তাদের পরিচালনা পদ্ধতি ও অন্য কাগজপত্র নিয়ে পড়াশোনা করি। তখন থেকেই শুরু প্রবীণনিবাসের স্বপ্ন।

প্রথমে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্তদের কথা মাথায় রেখে বৃদ্ধাশ্রমের পরিকল্পনা করি। কিন্তু পরিকল্পনাটা খুবই ব্যয়বহুল মনে হলো। ঢাকার জমি আমাদের নাগালের বাইরে। আমার স্বামী ধামরাইয়ের বাড়িটি কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহ দেন। গ্রামের বাড়ির স্বাদ নিতে একটু জমি কিনে ছোট বাড়িটা করেছিলাম।

শুভাকাঙ্ক্ষীদের উৎসাহ নিয়ে কাজ শুরু করি। তত দিনে শরীরে রোগব্যাধি ও দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। যাঁদের অবস্থা আমার চেয়েও নাজুক, মনে হলো তাঁদের জন্য দ্রুত কিছু করা জরুরি। তখনই দরিদ্রদের জন্য প্রবীণনিবাস গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিই, বিনা মূল্যে যেখানে তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করাটা খুব সহজ ছিল না!

তহবিল গঠন

তহবিলের জন্য বিভিন্নভাবে কাছের বন্ধুদের সঙ্গে চিন্তা, চেষ্টা ও যোগাযোগ অব্যাহত রাখি। সৌভাগ্যই বলতে হবে, অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীকে পাশে পেয়েছি। খুব বড় কিছু দাতা আর হাজারো ছোট দাতা, সবার উৎসাহ ও সহযোগিতায় এগিয়ে চলে শৈলান প্রবীণনিবাস-এর কাজ।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের জীবনমানের ভিত্তিতে আলাদা মানের ব্যবস্থা রেখে বৃদ্ধাশ্রম করা যেতে পারে। প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রবীণদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়—শারীরিকভাবে চলাচলে সক্ষম ও বার্ধক্যজনিত অসুস্থ বা চলাচলে অক্ষম। আমরা মূলত চলাচলে সক্ষম অসহায় ও দুস্থ প্রবীণদের চিন্তা মাথায় রেখে গড়ে তুলি আমাদের প্রবীণনিবাস।

> প্রবীণদের একটা বড় সমস্যা হলো নিঃসঙ্গতা। তরুণ-তরুণীরা তাঁদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারে। এ ধরনের মিথস্ক্রিয়া প্রবীণদের গোধূলিবেলাকে করে তোলে রঙিন।

স্থানীয়দের সহযোগিতা

স্থানীয়দের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুরু থেকেই এখানে স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণও সর্বতোভাবে কাজ করেছে। দুজন স্থানীয় স্বনামধন্য ব্যক্তিও আমাদের ট্রাস্টি হিসেবে সব স্থাপনা তৈরির কাজ দেখভাল করেছেন।

স্থানীয় নবীনেরাও রাখছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

বাসিন্দা

বাসিন্দা পাওয়াও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পারিবারিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়—বাধা হয়ে দাঁড়ায় নানা বিষয়। পাছে লোকে কিছু বলে, সমাজের লোকদের মধ্যে এ ধরনের চিন্তাভাবনা কাজ করে। আছে কিছু ধর্মীয় নীতি, বুড়ো মা-বাবার দেখভাল ছেলেদের দায়িত্ব। রাষ্ট্রীয় নিয়মে ছেলেমেয়েরা মা-বাবার দায়িত্ব না নিলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এসব কারণে প্রবীণ পেতে আমাদের সমস্যা হচ্ছিল। আমরা বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকি। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবও কাজ করতে থাকে। অবশেষে ২০২২ সালের ২৬ মার্চ ২ জন প্রবীণকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে শৈলান প্রবীণনিবাস।

ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

নিবাস চালু করার পর ঠিকঠাক চালিয়ে নেওয়াটাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে আমাদের ট্রাস্টিদের সবাই প্রায় বয়োবৃদ্ধ। তাই নতুনদের এগিয়ে আসতে হবে, যারা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে প্রবীণদের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করতে আগ্রহী।

এখন এখানে ৫০ জনের বেশি প্রবীণ রয়েছেন। প্রত্যেকের জীবনেই গল্প রয়েছে, কিছু কিছু খুবই হৃদয়বিদারক। এখানে ছদ্মনাম ব্যবহার করে দুজনের কথা বলতে চাই।

চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর সালমাকে শারীরিক-মানসিকভাবে অত্যাচার করত ছেলে ও বউ। প্রায় তিন বছর আগে বাড়িওয়ালা তাঁকে এখানে রেখে যান। আজও কেউ তাঁর খোঁজ নিতে আসেনি। তাই মনের দুঃখে দরখাস্ত জমা দিয়ে রেখেছেন, মৃত্যুর পর কাউকে না জানিয়েই আমরা তাঁর কবরের ব্যবস্থা করতে পারব। ভাবুন, কতটা কষ্ট পেলে এ ধরনের সিদ্ধান্ত দিতে পারে মানুষ।

আমাদের আরেক বাসিন্দা আলম ছিলেন ঠিকাদার। দুই ছেলেকেই প্রকৌশলী বানিয়েছেন। বয়স্ক বাবার চলাফেরা-খবরদারিও হয়তো সহ্য করতে না পেরে কথায়, আচরণে অপমান করত ছেলেরা। শিক্ষিত বাবা জানতেন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মা-বাবার দেখভাল না করলে সন্তানদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। প্রবীণনিবাসে আসার আগেই তাই নিকটবর্তী থানায় গিয়ে ছেলেদের নামে না-দাবি কাগজে স্বাক্ষর করে এসেছেন, ছেলেরা ভবিষ্যতে যাতে কোনো আইনি জটিলতায় না পড়ে। বাবা মৃত্যুশয্যায় জানানোর পরও আলম সাহেবকে দেখতে আসেনি ছেলেরা। আমাদের এখান থেকে আইনের কথা মনে করিয়ে চিঠি গেলে এসে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় খুবই কান্নাকাটি করে। কিন্তু আড়াই বছরে একবারও আসেনি।

আমাদের নিবাসে বিভিন্ন সময় এক মাস থেকে দুই বছর অবস্থানের পর পরিবার ফেরত নিয়ে গেছে, এমন কেস ১০০-এর মতো। এটাকে আমরা ইতিবাচক অর্জন বলে মনে করি। কারণ, পরিবারই বয়স্কদের জন্য আদর্শ স্থান।

কিছু প্রস্তাব

- ঘরে ঘরে অবহেলিত প্রবীণ রয়েছেন। সামাজিক দিক বিবেচনা করে উন্নত দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।
- মূলত গরিব, অসহায় কিন্তু চলাফেরায় সক্ষম প্রবীণদের আমরা নিয়ে থাকি। সবার সঙ্গে সময় কাটিয়ে বুঝতে পারি অসচ্ছলতা বা আর্থিক সমস্যা একমাত্র কারণ নয়। ছেলে, মেয়ে, বউরা নিগ্রহ করে। অনেক ক্ষেত্রে প্রবীণদেরও কিছু ভুলত্রুটি থাকে। পুরুষাধিপত্যও কখনো কখনো অশান্তির কারণ হয়। কারণগুলো বের করে পুরোপুরি না হলেও কিছুটা সমাধানের চেষ্টা আমাদের করতে হবে। ধৈর্য, সহনশীলতা, মানিয়ে চলা, ত্যাগ করার মানসিকতার মাধ্যমে কিছুটা হলেও পারিবারিক মূল্যবোধ হয়তো ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আজকের ছেলেমেয়েদের কাছে মুরব্বিদের অবদানের কথা ধরতে হবে। প্রচারণার মাধ্যমে পারিবারিক মূল্যবোধ ও বন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে।
- সচ্ছলদের জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রবীণনিবাস করা যায়, সেবাগ্রহীতা যেখানে পূর্ণ ব্যয় বহন করবে। ব্যাংক বা বিমাপ্রতিষ্ঠানগুলো এ ক্ষেত্রে লগ্নি করতে পারে। উৎসাহ প্রদানের জন্য এ ধরনের লগ্নি থেকে আয়কে কর রেয়াত দিতে পারে সরকার।
- অসচ্ছলদের জন্য স্বল্প বা বিনা মূল্যে প্রবীণনিবাস, যার আংশিক বা সম্পূর্ণ দায়ভার বহন করবেন দানশীল ব্যক্তিরা। সরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে।
- যত প্রবীণনিবাস এ পর্যন্ত হয়েছে, সব কটির নিবন্ধন দিয়ে সরকার যদি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে, প্রবীণেরা আশ্বস্ত হতে পারবেন।
- প্রবীণেরা শুধু পরিবারেরই না, সমাজ ও রাষ্ট্রেরও বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সেই চিন্তা থেকেই সরকার প্রবীণদের জন্য প্রবীণ ভাতা চালু করেছে। তাঁদের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহে যা একেবারেই অপ্রতুল। এর পরিমাণ আরও বাড়াতে হবে।
- আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তরুণদের স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করা। নবীনদের বোঝাতে হবে তাদের নিজেদেরও একদিন এই পর্যায়ে যেতে হবে।
- বাসস্থান, খাদ্য, পোশাক, চিকিৎসা ছাড়াও প্রবীণদের একটা বড় সমস্যা হলো নিঃসঙ্গতা। স্কুল-কলেজের তরুণ-তরুণীরা স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দুস্থ প্রবীণদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারে। আমরা দেখেছি এ ধরনের মিথস্ক্রিয়া প্রবীণদের উৎফুল্ল করে, তাদের গোধূলিবেলাকে করে তোলে রঙিন।
- প্রবীণনিবাস সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দূর করতে হবে। না হলে অসংখ্য প্রবীণ ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকবেন।

শিল্পসংস্কৃতি ক্ষেত্রেও একটা বিপ্লব হওয়ার কথা ছিল

মহসিনা আক্তার
অভিনয়শিল্পী ও নির্দেশক,
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, স্পর্ধা

শৈশবের একটা ঘটনা খুব মনে পড়ে, আমাদের পাড়ায় কলেজপড়ুয়া এক বড় আপা ছিল, তার কণ্ঠের জাদু পুরো জেলায় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে সবাই একবাক্যে স্বীকার করত, একদিন সে সত্যিই বড় শিল্পী হবে। বিভাগীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অনেক অনুষ্ঠানেই সে অংশ নিত। পড়াশোনা ও গানের অনুষ্ঠানের কারণে অন্য ছেলেমেয়েদের তুলনায় সে বেশি ব্যস্ত সময় পার করত। সমাদরও অন্যদের চেয়ে বেশি পেত। এ সময় মেয়েটি পাশের বাড়ির 'সম্ভ্রান্ত সুশীল' পরিবারের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়া যোগ্য ছেলের প্রেমে পড়ল। সুশীল পরিবারের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, ছেলের বাবা কিছুতেই এই গানবাজনা করা মেয়েকে পুত্রবধূ হিসেবে মেনে নিতে রাজি নন। জেদি ছেলেটিও কিছুতেই ভালোবাসার মানুষকে ছাড়তে রাজি নন। মহল্লাবাসীও সব ছেড়ে এই দ্বন্দ্বে শামিল হলো। কেউ ছেলের পক্ষ নিল, কেউ মেয়ের। অবশেষে ছেলের জেদের কাছে হার মেনে রাজি হলেন বাবা, তবে শর্ত একটাই-গান ছাড়তে হবে। কোথাও কোনো অনুষ্ঠানেও আর গাইতে পারবে না মেয়ে।

বিয়ে হয়ে গেল। এরপর কোনো অনুষ্ঠানে গাওয়া তো দূরের কথা, আপাকে আর গুনগুন করতেও দেখা যায়নি। পাড়ার সমজদার লোকেরা কিছুদিন কানাঘুষা, হা-হুতাশ করল, তারপর সবাই বিষয়টা বেমালুম ভুলে গেল। কারণ, সমাজে সৃজনশীল মানুষের অপরিহার্যতা বিষয়ে এ দেশের মানুষের মন সব সময় দোদুল্যমান ছিল। তাই মানুষ ভাবল, যা হলো, হয়তো ভালোই হলো।

তবু পেছনপানে যদি তাকাই, ৯০-এর দশকের শুরুর দিকে যে মফস্‌সল আমি চিনতাম, তার চেহারা কিছুটা ভিন্ন ছিল। কিছু শান্ত অবস্থা মানুষের মধ্যে বিরাজমান ছিল। আমরা মেয়েরা খুব ভোরে মাথায় লম্বা ওড়না টেনে, ছেলে শিশুরা মাথায় টুপি দিয়ে, হাতে আমপারা নিয়ে লাইন করে পাড়ার নানির কাছে কোরআন শিখতে যেতাম। আর সন্ধ্যাবেলায় হারমোনিয়াম নিয়ে সারগাম করতাম। পাড়ার মানুষ শুনত আর জানত, এই মহল্লায় কোন ছেলে বা মেয়ে ভালো গান গায়। পরিবারে ও সমাজে সংস্কৃতিচর্চার একটা ঝোঁক ছিল। সে সময় মফস্‌সল শহরগুলোয় ভালো শিল্পী হলে তাকে আশপাশের সবাই চিনত, সুনাম করত। বাড়ি বাড়ি তাই সকাল-বিকেল হারমোনিয়ামের আওয়াজ শোনা যেত। কেউ না কেউ কোথাও হারমোনিয়াম নিয়ে বসে তালিম করছে, ছবি আঁকছে। সদ্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে মঞ্চনাটক, আবৃত্তির দল করছে। সমাজ ও দেশ নিয়ে আলাপ করছে। সমাজসংস্কারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে। আমরা ছোটরা তাদের মতো হতে চাইতাম। এখন নিজের সেই মহল্লায় বা কাজের সুবাদে অন্য শহর, যেখানেই যাই, মনে পড়ে না, কবে একটা হারমোনিয়ামের শব্দ শুনেছি।

গানবাজনা নাকি সম্মান

বড় হয়ে বুঝেছি, আমাদের সমাজে সব সময় সৃজনশীল সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে 'অসম্মান' শব্দটা যুক্ত ছিল। কিন্তু এর ভেতরেই শৈশবে আমাদের গান, আবৃত্তি, নাটকের চর্চা চলেছিল। আমাদের পাড়াতো বড় আপার বিয়ের মধ্য দিয়ে সংগীতচর্চার অবসান যখন হলো, আমরা তখন বুঝিনি, একদিন আমাদের সবার পরিস্থিতিই এক হবে; হয় গানবাজনা, নাটক; না হয় 'সম্মান'—একটাকে বেছে নিতে হবে। আমার শৈশবের বন্ধুরা তাই সবাই সম্মানের পথ বেছে নিল। কেউ চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, গৃহিণী, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষকতার পথ ধরল...আমি বেছে নিলাম অসম্মানের পথ, পড়াশোনা শুরু করলাম নাটকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিভাগে ভর্তি হয়ে বুঝতে পারলাম যে এই পড়ালেখার কোনো দাম নেই। ভর্তিপ্রক্রিয়াও তা-ই। যারা আর কোনো বিষয় পায় না, তারা পড়বে এই সব : নাটক, সংগীত ইত্যাদি। নিরক্ষর মানুষ এই নিয়ম তৈরি করেনি। বুদ্ধিজীবীরা অনেক মেধা অপচয় করে এই নিয়ম বানিয়েছেন। তাই প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে অবহেলিত-উপেক্ষিত বিষয় থিয়েটার, সংগীত, ফিল্ম, নৃত্য। এ যেন পরিবারের সবচেয়ে দরিদ্র 'আনকালচারড' খালা বা চাচার পরিবার, যাদের পাতে নেওয়া যায় না, আবার ফেলাও যায় না। কিন্তু এই বুদ্ধিজীবীদের মাথায় কখনো কেন এই প্রমাণিত সত্য ধরা দেয় না যে একজন সত্যিকারের সৃজনশীল মানুষের মেধার তুলনা কারও সঙ্গে চলে না। হাজার হাজার মেধাবী চিকিৎসক হতে পারেন, কিন্তু সব চিকিৎসক আন্তন চেখভ হবেন না। সব ইঞ্জিনিয়ার বাদল সরকার হন না, সচিব হওয়ার মেধা থাকলেই সবাই শহীদুল জহির হন না। সব সৃজনশীল মানুষই আবার তাঁর কাজ দিয়ে মেধা, দিয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠেন না, কিন্তু একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী তৈরিতে সব সৃজনশীল মানুষের কাজের পরোক্ষ ভূমিকা থাকে। রাষ্ট্র ও সমাজের এই বৈষম্যমূলক আচরণ সেই পথকে ব্যাহত করছে। সৃজনশীল শিল্পের প্রতি এই বৈষম্য, তুচ্ছতাচ্ছিল্য চিরকালের। একদিকে রাষ্ট্র সব সময় শিল্পীদের ভয় পেয়েছে। দমিয়ে রাখতে চেয়েছে। অন্যদিকে শিল্পীদের অনিশ্চিত জীবন, কট্টরপন্থীদের আগ্রাসন, হুমকি-ধমকি সাধারণ মানুষের মধ্যে শিল্পপ্রীতি কমিয়েছে।

কথা ছিল নতুন শিল্পপরিচয় হবে

গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে শিল্পচর্চার অবস্থান কী, তা এখন পরিষ্কার। এর আসল চেহারা যেন কঙ্কালসমেত ফুটে উঠেছে। একদিকে বিগত বছরগুলোয় রাষ্ট্রের ছায়াতলে গজিয়ে ওঠা ক্ষমতার পক্ষে কথা বলা সুবিধাভোগী শিল্পীরা, যাঁরা হা-হুতাশ করছেন, ডুব দিয়ে আছেন, কী করে পরিস্থিতি আরও ঘোলা করে ফায়দা নেওয়া যায়; অন্যদিকে চাপা দিয়ে রাখা কট্টর উগ্র ইসলামপন্থীরা, তলে তলে যাঁরা গড়ে উঠেছেন, তাঁরা মাথা বের করছেন। তাঁরা এখন নোংরাভাবে প্রকাশ্যে সংস্কৃতিচর্চাকে নির্মূল করতে চাচ্ছেন। স্কুলে সংগীত শিক্ষকের পদ তাঁরাই গিলতে চাচ্ছেন। নানা শঙ্কায় ঘরে বসে গেছেন ভীত-সন্ত্রস্ত শিল্পীরা।

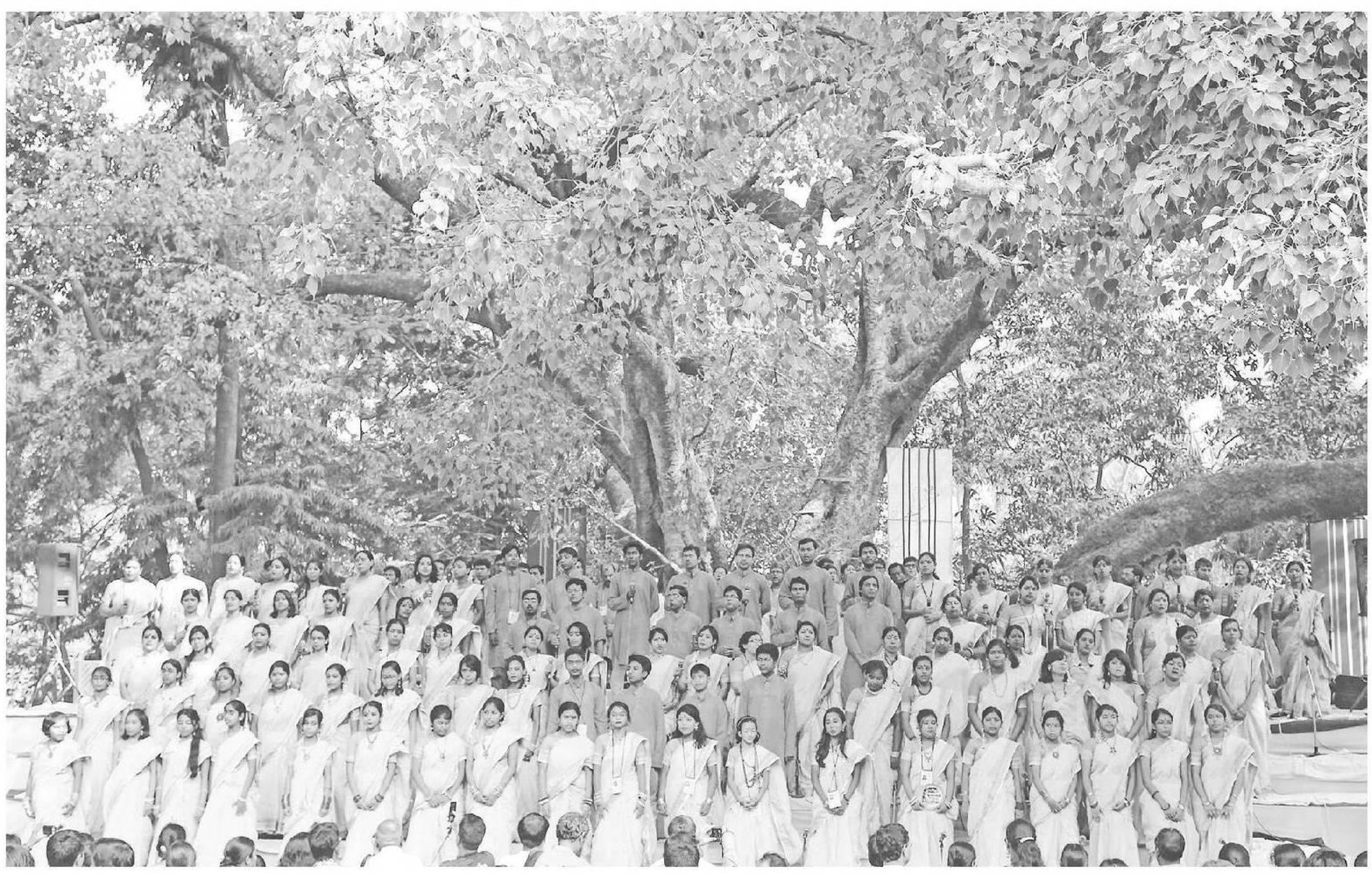
যে সংস্কৃতি এই অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছে, অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে তার শিকড় খুঁজে বের করার কথা ছিল। ছবি : প্রথম আলো

> সারা পৃথিবীতে শিল্পের পথ কখনো মসৃণ ফুলবিছানো ছিল না, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলয়ের ছায়াতলে থেকে কোনো কালে কোনো শিল্পী বা শিল্পকর্ম মহান হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে শিল্পক্ষেত্রে একটা বিপ্লব হওয়ার কথা ছিল। মন খুলে গানে, নাটকে, কবিতায় মানুষের কথা বলার কথা ছিল। সব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের নিজেদের শিল্পের ভাষা খোঁজার কথা ছিল। আমাদের জীবনযাপনের যে সংস্কৃতি এই অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছে, তার শিকড় খুঁজে বের করে, নতুন শিল্পপরিচয় তৈরি করার কথা ছিল। কয়েক মাস এ বিষয়ে আলোচনাও চলেছিল। কিন্তু আশ্চর্য! এই সময়ে এসে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সব জায়গায় কেবল চাপা উদ্বেগ ও হতাশা। যেন উত্তরণের কোনো পথ নেই। কাজ নেই, আলোচনা নেই। অধিকাংশ শিল্পী সুদিনের আশায় ঘরে বসে গেছেন। মাঝেমধ্যে ফেসবুকে উঁকি দিচ্ছেন আর কাজ না করে হতাশা ঝাড়ছেন, অপেক্ষা করছেন, কবে ভালো দিন আসবে, বুঝেশুনে পা বাড়াবেন। কট্টরপন্থীদের নানা রকম বাধা, হামলা, নয়তো সরাসরি আক্রমণ চলছে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এর কোনো প্রতিকার নেই। রাষ্ট্র বরাবরের মতো একই ভূমিকা পালন করছে। সবচেয়ে অবহেলিত সৃজনশীল খাত। নামেমাত্র বাজেট বাড়ানো হয়েছে, যা মোট বাজেটের একহাজার ভাগের এক ভাগও নয়। শিল্পকলা একাডেমিসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রায় অকেজো করে রাখা হয়েছে। লুটপাট চলছে। যে নতুন বাংলাদেশে কথা বলার স্বাধীনতা থাকার কথা ছিল, সেখানে হল বরাদ্দ না দিয়ে সূক্ষ্মভাবে কিছু নাটকের ওপর নিষেধাজ্ঞাও চলছে। নতুন কোনো উদ্যোগ নেই। ভালো কোনো শিল্প সৃষ্টিতে রাষ্ট্রের কোনো পৃষ্ঠপোষকতা নেই। সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার কোনো সদিচ্ছা নেই। মফস্‌সলে, গ্রামে-গঞ্জে নতুন প্রজন্মকে সৃজনশীল কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেই।

দুর্বলেরা লড়াইয়ে টেকে না

রাস্তায় চলি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চোখ রাখি। একটা অভিব্যক্তি, কামড়াকামড়ি, রাগ, হিংস্রতা-বাংলাদেশের মূল স্পন্দন এখন এ-ই। আমাদের অস্তিত্বগত উদ্বেগ প্রকাশে এডভার্ড মুঙ্কের চিত্রকর্ম 'দ্য স্ক্রিম' অনেক পেছনে পড়ে গেছে। কারণ, আমাদের অস্তিত্বগত উদ্বেগ এখন আরও ভয়ংকর, বীভৎস। সারা বাংলাদেশেই একই রকম বোধ। যে দেশ জারি, সারি, ভাটিয়ালির, সেখানে যেন কোনো লাবণ্য নেই, কোনো কমনীয়তা নেই, কোনো সুর নেই। শিশু-কিশোরেরা হত্যাকাণ্ডের মতো অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে। নেশাদ্রব্য গ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাদা আর কালোর বাইরে আর কিছু এরা চিনছে না। মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। উদ্বেগ আর বিষাদ মানুষকে গ্রাস করছে। নিজের মতামতে আমরা প্রত্যেকেই কট্টর মৌলবাদী। জাতিগতভাবে আমরা এই জায়গায় কী করে দাঁড়ালাম? রাষ্ট্র কী পদক্ষেপ নিচ্ছে মানবিক উন্নয়নে? জীবনযাপনের উন্নয়নে? এই জানা কথাগুলো বলা জরুরি। কারণ, আমাদের জীবনধারণের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠছে আর আমাদের সৃজনশীল সংস্কৃতিচর্চা, তা একে অপরের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা চিন্তা করলে চলবে না। আর কোনো পথ খোলা না থাকলে নতুন প্রজন্ম সিরাজগঞ্জের যুবকের মতোই হিংস্র হয়ে উঠবে, নিজের দাদির মতো কোনো আপনজনের কল্লা নামিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না। কারণ, আমরা সুদিনের অপেক্ষায় থাকলেও স্বার্থলোভীরা কাজ করে যাচ্ছে, কোমল মস্তিষ্ককে ধীরে ধীরে চিবিয়ে খাচ্ছে। খেয়ে শেষ করবে।

সারা পৃথিবীতে শিল্পের পথ কখনো মসৃণ ফুলবিছানো ছিল না, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলয়ের ছায়াতলে থেকে কোনো কালে কোনো শিল্পী বা শিল্পকর্ম মহান হয়ে ওঠেনি। যখন আর কোনো উপায় নেই, তখন শিল্পীদের নিজেদের চেষ্টায় নানা উপায়ে এ সময় চতুর্গুণ কাজ করা দরকার। যত বাধা আসবে, তার দ্বিগুণ উপায় বের করা প্রয়োজন—সম্মিলিতভাবে। কারণ, এটা অস্তিত্বের লড়াই। আর এটা প্রমাণিত যে দুর্বলেরা লড়াইয়ে টিকে থাকে না। তাই হে বন্ধু, হে আলোর পথযাত্রী, এ যে রাত্রি, এখানে থেমো না...

NABIL
GROUP
প্রয়োজনে কিংবা
আয়োজনে...
নাবিল
নাবিল ফিড
পোল্ট্রি | ফিস | ক্যাটল
ফুডেলা
নাবা
ক্রপ কেয়ার

স্বাস্থ্য খাতে সমতা নিশ্চিত করা জরুরি

রুমানা হক
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সূচকে বাংলাদেশ আজ একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। দুই দশক আগেও প্রতি লাখ শিশু জন্ম দিতে মারা যেতেন চার শতাধিক মা, এখন তা কমে এসেছে অর্ধেকের বেশি। নবজাতকের মৃত্যুও প্রতি হাজারে ৪৪ থেকে কমে ২০-এ নেমে এসেছে। স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের এই অর্জন কোনো একক প্রকল্পের ফল নয়। সত্তরের দশকে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরুর সময়েই এই পরিবর্তনের বীজ বোনা হয়েছিল। পরিবার পরিকল্পনা, প্রসবকালীন জরুরি সেবা, নারীশিক্ষার প্রসার থেকে গ্রামীণ উন্নয়ন ও প্রায় শতভাগ নবজাতককে টিকার আওতায় আনা—এসব ধারাবাহিক প্রচেষ্টাতেই আজকের এই অগ্রযাত্রা।

বাংলাদেশ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ ৬৫ থেকে কমে ৫১ শতাংশ হয়েছে ও গর্ভকালে অন্তত একবার চিকিৎসা গ্রহণ ৩৪ থেকে বেড়ে ৮৮ শতাংশে পৌঁছেছে। একই সময়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসবের হার ৮ থেকে বেড়ে ৬৫ শতাংশ হয়েছে আর কিশোরী গর্ভধারণ ৩৫ থেকে ২৩ শতাংশে নেমেছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতিও এই সাফল্যে অবদান রেখেছে। আমাদের নারী সাক্ষরতার হার ৫৪ থেকে ৮৬ শতাংশ হয়েছে। অধিকাংশ ঘরে পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ আর মুঠোফোন।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও অসামান্য। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, দারিদ্র্য কমে ৪৯ থেকে ১৯ শতাংশে নেমে এসেছে। শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণও ২৩ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩২ শতাংশ। সমন্বিত সামাজিক অগ্রগতি দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে মাতৃ ও নবজাতকের মৃত্যুহার কমাতে ভূমিকা রাখলেও গবেষণা বলছে, ২০১০ সালের পর এ গতি মন্থর হয়ে এসেছে। গবেষকদের মতে, এর মূলে আছে বৈষম্য।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর প্রায় সব সমস্যার মূলেই আছে কোনো না কোনো ধরনের বৈষম্য।'

স্বাস্থ্যে বৈষম্য মানে শুধু এই নয় যে কেউ অসুস্থ আর কেউ সুস্থ। এর অর্থ, কারও আছে বাঁচার সুযোগ, কারও নেই। কেউ হাতের নাগালে চিকিৎসা পান, কেউ সেই একই সেবার জন্য পাড়ি দেন মাইলের পর মাইল। কারও সন্তান জন্মায় চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আর কারও সন্তান চিকিৎসাসুবিধার অভাবে জন্মের আগেই হারিয়ে যায়।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে সাফল্যের গল্প যেমন আছে, তেমনি রয়েছে সতর্কতার বার্তাও। সেবার মানোন্নয়ন, দারিদ্র্য, শিক্ষা ও ভৌগোলিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং বেসরকারি খাতে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া মৃত্যুহ্রাসের গতি ধরে রাখা কঠিন। রাষ্ট্র অনেকের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই সেবার মান ও সমতা এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি।

নারী, পুরুষ এবং অন্যান্য

বাংলাদেশে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নারীকেন্দ্রিক হলেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার অভাব, পারিবারিক ও সামাজিক অনুমতি ও আর্থিক নির্ভরশীলতা নারীদের সেবা গ্রহণে বড় বাধা। এ বৈষম্য মানে শুধু নারীদের ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, পরবর্তী প্রজন্মেও পড়ে এর প্রভাব। শিশু প্রসবের সময় মা যথাযথ সেবা না পেলে নবজাতকের জীবনের প্রথম মাসটিই হয়ে ওঠে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। গর্ভকালীন যত্ন, নিরাপদ প্রসব এবং অসংক্রামক রোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও নারী বৈষম্যের শিকার হন। পরিসংখ্যান বলছে, ৩৫ বছর বা তদূর্ধ্ব নারীদের ৩৬ শতাংশ উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন, যেখানে পুরুষদের এই হার ২৩ শতাংশ।

অন্যদিকে তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী এখনো দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার এক অদৃশ্য পরিসরে বাস করে। সরকারি নথিতে 'হিজড়া' হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও বাস্তবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল বা সরকারি কর্মসূচিতে তারা প্রায় অনুপস্থিত। সামাজিক বৈষম্য, অবজ্ঞা ও ভয়ের কারণে অনেকেই চিকিৎসা নিতে উৎসাহী হন না। ফলে প্রজনন ও মানসিক স্বাস্থ্য, এইচআইভি প্রতিরোধ ও হরমোন চিকিৎসা, সব ক্ষেত্রেই তারা বঞ্চিত ও অবহেলিত।

বেসরকারি সংস্থা বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ২০১৯ সালের সমীক্ষায় প্রায় ৭৩ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় কোনো প্রবেশাধিকার নেই; অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা এখন বহুমাত্রিক বৈষম্যের শিকার। একদিকে যেমন নারী ও পুরুষ এখনো স্বাস্থ্যসেবায় পূর্ণ সমতা পাননি, অন্যদিকে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা এখনো স্বাস্থ্যব্যবস্থার বাইরের নাগরিক।

মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা আজও গ্রামের অনেকের কাছে দূরবর্তী এক প্রতিশ্রুতিমাত্র। ছবি : প্রথম আলো

> স্বাস্থ্য খাতে তখনই আমাদের প্রকৃত অগ্রগতি হবে, যখন ধনী-গরিব, শহর-গ্রাম, নারী-পুরুষনির্বিশেষে সমানভাবে সুস্থ জীবন ধারণের অধিকার পাবেন।

শহর বনাম গ্রাম

নারী-পুরুষের মতোই গ্রামীণ নাগরিকেরাও শহরের মানুষের তুলনায় স্বাস্থ্যবৈষম্যের শিকার। শহরে হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ফার্মেসি বাড়লেও অনেক গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিকই এখনো একমাত্র ভরসা। ফলে স্বাস্থ্যসেবা আজও গ্রামের অনেকের কাছে দূরবর্তী এক প্রতিশ্রুতিমাত্র। ২০২২ সালের বাংলাদেশ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা অনুযায়ী, শহরে ৭৬ শতাংশ শিশুর জন্ম হয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, যেখানে গ্রামে এ হার ৬১ শতাংশ। শহরে চিকিৎসক, হাসপাতাল ও অ্যাম্বুলেন্স সহজলভ্য। অন্যদিকে দূরত্ব, ব্যয় ও সামাজিক বাধায় অনেক সময় ঘরেই সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য হন গ্রামীণ নারী। শহরের নারীরা চাইলেই চিকিৎসকের পরামর্শ এবং জরুরি অবস্থায় দ্রুত সেবা পান, সেখানে গ্রামীণ নারীর জন্য সেই পথ এখনো দীর্ঘ, ব্যয়বহুল ও অনিশ্চিত।

অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্য

স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্যের সবচেয়ে বড় ফারাকটি তৈরি করে অর্থনৈতিক অবস্থা। একজন মানুষের আয়, বাসস্থান ও পেশার পার্থক্যই নির্ধারণ করে তাঁর চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ, সেবার মান, এমনকি বেঁচে থাকার সম্ভাবনা।

২০২২ সালের জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা বলছে, দেশে গড়ে ৬৫ শতাংশ জন্ম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হলেও ধনী পরিবারের ৮৭ শতাংশ নারী সেখানে সন্তান জন্ম দেন আর দরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে এ হার মাত্র ৪২ শতাংশ; অর্থাৎ একজন মায়ের নিরাপদ মাতৃত্ব আজও নির্ভর করছে তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর।

নবজাতক মৃত্যুহারের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। দেশের গড় নবজাতক মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ২০ হলেও ধনী পরিবারে এই হার ১২ আর দরিদ্রতম পরিবারে প্রায় ৩১; অর্থাৎ প্রায় তিন গুণ! একমাত্র টিকাদান কর্মসূচিতেই এই অর্থনৈতিক বৈষম্য তুলনামূলকভাবে কম।

ভৌগোলিক বৈষম্য

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার মান ও প্রাপ্যতা শুধু শহর ও গ্রামের মধ্যে নয়, বিভাগ বা অঞ্চলভেদেও ব্যাপকভাবে ভিন্ন। রাজধানী ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে হাসপাতাল, চিকিৎসক ও ওষুধের সহজলভ্যতা তুলনামূলক বেশি; বিপরীতে দেশের উত্তরাঞ্চল, পাহাড় ও উপকূলীয় এলাকা এবং হাওরাঞ্চলের মানুষ এখনো প্রাথমিক সেবার জন্য লড়াই করছেন। জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা বলছে, ময়মনসিংহ, সিলেট ও রংপুর বিভাগে নবজাতক মৃত্যুহার দেশের গড়ের চেয়ে অনেক বেশি, আর বরিশাল, রাজশাহী ও খুলনা তুলনামূলকভাবে ভালো। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসবের হারেও একই প্রবণতা, ঢাকা বা খুলনায় যেখানে এই হার ৭০ শতাংশের বেশি, সেখানে ময়মনসিংহ, বরিশাল ও সিলেটে তা এখনো অর্ধেকের কাছাকাছি।

দুর্নীতিজনিত বৈষম্য

বিভিন্ন অনিচ্ছাকৃত সামাজিক ও কাঠামোগত বৈষম্যের বাইরে স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতিও এখন বৈষম্যকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ২০২৩ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রায় অর্ধেক পরিবার কোনো না কোনোভাবে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়। অ্যাম্বুলেন্সের মতো জরুরি সেবাতেও সক্রিয় রয়েছে প্রভাবশালী সিন্ডিকেট। ফলে বিনা মূল্যের সেবা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন দরিদ্র মানুষ, উল্টো নিজ পকেট থেকে ব্যয় করতে হচ্ছে অর্থ।

ওষুধ কেনা থেকে হাসপাতাল নির্মাণ, নিয়োগ থেকে সেবা প্রদান—প্রতিটি ধাপে জবাবদিহির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। সরকারি হাসপাতালে বিনা মূল্যের ওষুধ ও স্বল্পমূল্যে পরীক্ষার অপর্যাপ্ততার কারণে অধিক অর্থ লাগলেও রোগীরা বাধ্য হয়েই বেসরকারি হাসপাতালমুখী হন। ফলে সেবা পাওয়ার মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত থাকছেন সীমিত সামর্থ্যের মানুষ।

বৈষম্য কমানোর পথ

এখন প্রশ্ন, এই বৈষম্য রোধের উপায় কী? একটাই উত্তর, স্বাস্থ্যসেবা ও নীতিতে সমতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা। প্রথমেই পিছিয়ে থাকা অঞ্চল-গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে, সেখানে লক্ষ্যভিত্তিক বিনিয়োগ, পর্যাপ্ত জনবল, ওষুধ ও অবকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে। পাশাপাশি সেবার গুণগত মান ও কার্যকারিতা নিশ্চিতে প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও পরিবারকে স্বাস্থ্যসমতার আওতায় আনতে হবে। তাই স্বাস্থ্যসূচকের পরিসংখ্যানে বৈষম্যের বিশ্লেষণও জরুরি। স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য নিয়মিত জেলা, উপজেলা পর্যায়ের তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, বাড়াতে হবে নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের উপস্থিতি।

কারও আবাসস্থল, সামাজিক অবস্থান বা অর্থনৈতিক সামর্থ্য যেন তাঁর জীবন-মৃত্যুর নির্ধারক না হয়। স্বাস্থ্য খাতে তখনই আমাদের প্রকৃত অগ্রগতি হবে, যখন ধনী-গরিব, শহর-গ্রাম, নারী-পুরুষনির্বিশেষে সমানভাবে সুস্থ জীবন ধারণের অধিকার পাবেন।

স্বাস্থ্য খাতে আমাদের যাত্রা সেদিক পানেই হোক।

Daffodil International University

A Top Ranked University
THE World University Rankings 2026 | Times Higher Education Impact Rankings 2025 | QS World University Rankings | US News Best Global Universities

DIU strategically recruits **industry experts and foreign faculty** and uses **industry-relevant curricula** to deliver dynamic teaching that directly prepares our students for success in the **global job market.**

Secure your future!

Spring 2026 admission is now open

Enroll now to fulfill your personal dreams and meet the expectations of your family

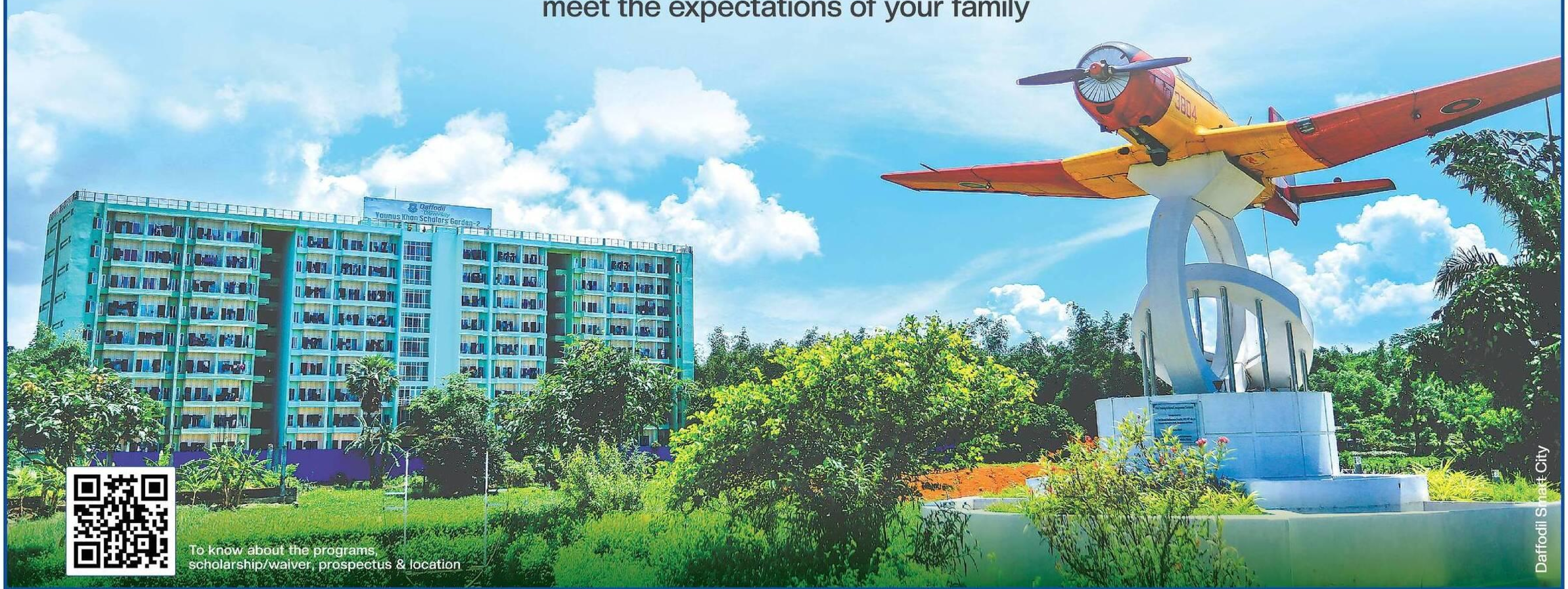

To know about the programs, scholarship/waiver, prospectus & location

Contact us
Daffodil Smart City, Birulia, Savar, Dhaka-1216.
admission@daffodilvarsity.edu.bd

Admission Helpline:
09617901212

Please Visit:
www.daffodilvarsity.edu.bd

Apply Online:
http://admission.daffodilvarsity.edu.bd

Trust Retail Banking

Trust Bank PLC.
A Bank for Financial Inclusion

আপন নিবাস
হাউজ ফাইন্যান্স লোন

সহজ লোনে স্বপ্নপূরণ

বাড়ি ক্রয়, নির্মাণ বা সংস্কার করতে আমরা আছি আপনার পাশে। এবার স্বপ্নের বাড়িটা হোক সত্যিই আপনার সাধ্যের মধ্যে, ট্রাস্ট ব্যাংক আপন নিবাস হাউজ ফাইন্যান্স লোনের মাধ্যমে।

- সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা পর্যন্ত লোন
- আকর্ষণীয় ইন্টারেস্ট রেট
- আবেদনকারীর বয়স ন্যূনতম ২৫ বছর
- লোনের মেয়াদ সর্বোচ্চ ২৫ বছর

*শর্ত প্রযোজ্য

বিস্তারিত জানতে কল বা স্ক্যান করুন
১৬২০১

/TrustBankLtdBD www.tblbd.com

মাঠে জিত, বাইরে হার

সাথিরা জাকির
সাবেক ক্রিকেটার, বিশ্বকাপে প্রথম বাংলাদেশি নারী আম্পায়ার

ভারতে বসে এই লেখা লিখছি। নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম কোনো বাংলাদেশি নারী হিসেবে মাঠে, টিভি পর্দার সামনে, চতুর্থ আম্পায়ারের ভূমিকায় আম্পায়ারিং করছি। প্রতিটি পদক্ষেপে দৃঢ় থাকার চেষ্টা করছি। এ জন্য প্রশংসাও পাচ্ছি।

এটাকে শুধু ব্যক্তিগত অর্জন হিসেবেই দেখি না, খেলাধুলায় মেয়েদের সংগ্রামের ফসল এই অর্জন। আমাদের মেয়েরা এখন ক্রীড়াঙ্গন আলোকিত করছে। দেখে সাবেক ক্রিকেটার এবং একজন নারী হিসেবে গর্বে বুকটা ভরে ওঠে। গত কয়েক বছরে বিভিন্ন খেলায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের জয়যাত্রা সত্যিই চোখে পড়ার মতো।

২০১৮ সালে কুয়ালালামপুরের ক্রিকেট মাঠে লেখা হয় নতুন ইতিহাস। নারীদের টি-২০ এশিয়া কাপ ক্রিকেটে শিরোপা জেতে আমাদের মেয়েরা। আগে যেখানে সব সময় জয়ী হতো ভারত, সেখানে আমাদের কন্যারা প্রথমবারের মতো হাতে তুলে নেয় ট্রফি। ছেলেরা এখনো সেই উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেনি। এদিক থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় ট্রফিটা মেয়েরাই এনেছে।

ফুটবল মাঠেও উড়ছে জয়পতাকা। ২০২২ ও ২০২৪—পরপর দুবার দক্ষিণ এশিয়ার সেরা হিসেবে মঞ্চ আলো করেছে বাংলাদেশের মেয়েরা। এ বছর প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছেছে তারা, এএফসির চূড়ান্ত পর্বেও নাম লিখিয়েছে অনূর্ধ্ব-২০ দল। আর অনূর্ধ্ব-১৬ দল দুবার খেলেছে এএফসির চূড়ান্ত পর্বে। সাফের সেরা আমাদের দুই ফুটবল-কন্যা সাবিনা খাতুন ও ঋতুপর্ণা চাকমা। এখনো চোখে ভাসে নেপালের বিপক্ষে ঋতুর জয়সূচক আর মিয়ানমারের বিপক্ষে জোড়া গোল।

প্রথম আলোর ক্রীড়া পুরস্কারে সব খেলা মিলিয়ে সাবিনা খাতুন ও ঋতুপর্ণা চাকমার বর্ষসেরা খেলোয়াড় হওয়াটাও ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদের সাফল্যই নির্দেশ করে। আরও সুখবর, সাবিনা-ঋতুপর্ণাসহ ১৬-১৭ জন বাংলাদেশি নারী ফুটবলার এবার ভুটানে লিগে খেলেছে।

সেই তুলনায় বলতেই হবে ছেলেরা পিছিয়ে আছে। এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে তারা শুধু ১৯৮০ সালে খেলেছে। এ বছর হামজা চৌধুরীসহ প্রবাসী খেলোয়াড়দের নিয়ে আশা ছিল ৪৫ বছর পর চূড়ান্ত পর্বে উঠবে, কিন্তু স্বপ্ন পূরণের অনেক আগেই তাঁদের থামতে হয়েছে। সেই ২০০৩ সালে সাফে শিরোপা জিতেছে ছেলেরা। অপেক্ষা কত দিন চলবে জানা নেই।

এশিয়ান নারী চ্যাম্পিয়নশিপে গত মার্চে কাবাডিতে প্রথমবার ব্রোঞ্জ জিতেছে আমাদের মেয়েরা। ২০২৩ সালে ইন্দোনেশিয়ায় বিশ্বকাপ শুটিংয়ে কামরুন নাহার কলি ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে অষ্টম স্থান অর্জন করে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাফল্য গড়েছেন।

চীনে অনূর্ধ্ব-১৮ এশিয়া কাপ হকিতে তিন মাস আগে ব্রোঞ্জ জিতেছে বাংলাদেশের মেয়েরা। দলীয় ও ব্যক্তিগত খেলায় তারা এগোচ্ছে। ২০১৬ এসএ গেমসে মাবিয়া আক্তারের সোনা জয়ের কান্না ও সাঁতারু মাহফুজা খাতুনের জোড়া সোনা নারী ক্রীড়ার বড় মুহূর্ত।

স্বাধীনতার আগে পাকিস্তান অলিম্পিকে সোনা জিতে পূর্ব বাংলার লুৎফুন নেছা হক, জিনাত আহমেদ, রওশন আক্তাররা। ১৯৬৮ সালে ঢাকায় পাকিস্তানের দ্রুততম মানবী হন সুফিয়া খাতুন। স্বাধীনতার আগে-পরে তিন বোন কাজী জাহেদা, কাজী নাসিমা, কাজী শামীমা ক্রীড়াঙ্গন আলোকিত করেন। ১৯৮১ সালে ইন্দোনেশিয়ায় চতুর্থ এশিয়ান জুডোতে ব্রোঞ্জ জেতেন কামরুন নাহার। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এটি বাংলাদেশের মেয়েদের প্রথম কোনো পদক। সময়ের সঙ্গে বেগবান হয়েছে সেই যাত্রা। দাবার কিংবদন্তি রানী হামিদ ৮২ বছরেও খেলছেন; টেবিল টেনিসে ১৬ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিনেস বুকে নাম তোলা জোবেরা রহমান লিনু আমাদের আদর্শ।

তবুও বঞ্চনা

কিন্তু আজও প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত মেয়েরা। পরিবার-সমাজের মতের বিরুদ্ধে তাদের এখনো লড়তে হয়। লড়াইটা অনেক সময় ফেডারেশনের বিরুদ্ধেও করতে হয়। যৌন হয়রানি বা নিরাপত্তাহীনতার কথা কে না জানে। সাফল্যের তুলনায় মেয়েদের প্রাপ্তিও কম। আজও নানাভাবে বৈষম্যের শিকার তারা। নানা সংকটে আবর্তিত হয় তাদের জীবন। সুযোগ-সুবিধার অভাব। মেয়েদের প্রতি সমাজ-সংসারের বিশ্বাসের অভাবও রয়েছে।

২০০৭ সালে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের যাত্রার শুরুতে আমাদের চারপাশে কেউ বিশ্বাসই করত না, বাংলাদেশের মেয়েরা ক্রিকেট খেলতে পারবে। তাই শুধু মাঠেই না, মাঠের বাইরেও অনেক কিছুর সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হয়েছে। পরিবার ও সমাজের অনেক কথা শুনতে হয়েছে। অনেকে প্রশ্ন করত, 'মেয়েরা ক্রিকেট খেলে কী হবে?'

সেই সময় আমরা নিশ্চিত ছিলাম না, খেলাটা ক্যারিয়ার হিসেবে নেওয়া কতটা সম্ভব। আজ থেকে ১৮ বছর আগে জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের শুরুর সময় আমরা দৈনিক হাতখরচ পেতাম মাত্র ৫০ টাকা। ধানমন্ডি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে কষ্ট করে থাকতে হতো, ছোট মাঠে অনুশীলন করতে হতো। সুযোগ-সুবিধার অভাব ছিল, আর্থিক কোনো সহায়তাও ছিল না। আমরা জানতাম ক্রিকেটের জন্য সময় দিলে পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবু ঝুঁকি নিয়েছিলাম। বিশ্বাস ছিল, একদিন আমরা এগোব। সত্যিই আমরা এগিয়েছি।

> ৪২ লাখ টাকা বাজেটের জাতীয় সাঁতারে ব্রোঞ্জজয়ীর জন্য এই যুগে ৫০০ টাকা পুরস্কারকে তামাশা ছাড়া আর কীই-বা বলা যেতে পারে!

কিন্তু ক্রিকেটে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের বেতন ও ম্যাচ ফি এখনো অনেক কম। সম্প্রতি দৈনিক ভাতা সমান করা হয়েছে—ছেলেরা ১০০ ডলার পেলে মেয়েরাও তা-ই পাবে। আগে মেয়েরা পেত ৫০-৭৫ ডলার। ভারত, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায় মেয়েরা ছেলেদের সমান ভাতা ও ম্যাচ ফি পায়, কিন্তু বাংলাদেশে স্পনসরের অভাবে ম্যাচ ফি সমান হওয়া হয়তো সম্ভব নয়।

স্পনসরের অভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন খেলায় মেয়েদের জন্য আলাদা লিগ বা টুর্নামেন্ট খুব কম হয়। ফুটবলে সাফল্য থাকা সত্ত্বেও মেয়েদের জন্য ঘরোয়া খেলা বা বর্ষপঞ্জি নেই। ঢাকায় সর্বশেষ লিগের পর ১৭ মাস ধরে কোনো ঘরোয়া আয়োজন হয়নি, অথচ ছেলেদের জন্য পাঁচটি টুর্নামেন্ট হচ্ছে। গত বছর সাফজয়ী দলও প্রতিশ্রুত দেড় কোটি টাকা অর্থ পুরস্কার পায়নি, এশিয়ান কাপে প্রথমবার অংশগ্রহণ করেও কোনো আর্থিক পুরস্কার মেয়েদের ভাগ্যে জোটেনি। এখানেও বঞ্চিত আমাদের মেয়েরা ।

নারীদের বঞ্চনার তালিকা আসলে অনেক দীর্ঘ। সবচেয়ে বড় বৈষম্য কোচিং স্টাফে নারীর কম উপস্থিতি। ফুটবলের কোচিং স্টাফে নারী মাত্র একজন—সহকারী কোচ। আগে সব ফিজিওও ছিলেন পুরুষ। এখন অবশ্য একজন নারী আছেন। সালমা খাতুনকে কদিন আগে মাত্র বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের নির্বাচক করা হয়েছে, অথচ পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ভারতে কোচ-নির্বাচক সবাই সাবেক খেলোয়াড়। নারী খেলোয়াড়েরা অবসর নেওয়ার পর নেতৃত্ব বা কোচিংয়ে না এলে তাঁরা হারিয়ে যাবেন। এখানেও সংস্কারের সুযোগ আছে।

মেয়েদের খেলাধুলায় বড় বাধা বিয়ে ও সন্তান। বিয়ে হলে দলে থাকা কঠিন। ২০১২ সালে আমার বিয়ের পর দেশের সেরা খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় দল থেকে আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ফলে আজও অনেক ক্রীড়াবিদ বিয়ে করতে ভয় পান, ভাবেন ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে। এ ছাড়া সন্তান নিলে অন্তত দেড় বছর খেলোয়াড় বাইরে থাকে, এরপর ফিটনেস ফেরানো কঠিন।

অনেক নারী আবার বাসায় শিশুসন্তান রেখে খেলায় ফিরতে পারেন না। আমি ভাগ্যবান, পরিবারের সহায়তায় মাত্র তিন মাস বয়সী সন্তান রেখে খেলায় ফিরেছি। কিন্তু অনেক প্রতিভা বিয়ে বা সন্তান হওয়ার কারণে হারিয়ে যায়। ছেলেদের ক্ষেত্রে কিন্তু এমনটা হয় না। একজন মা সন্তানকে এক দিনও আলাদা রাখতে পারেন না। সন্তান হওয়ার পর বহু মেয়েকেই খেলায় ফিরতে দেয়নি পরিবার। ফলে অনেক প্রতিভাবান নারী খেলোয়াড় আমরা হারিয়েছি।

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

মেয়েদের চাকরির নিরাপত্তাহীনতাও বড় সমস্যা। ১৬-১৭ থেকে ৩০-৩৫ বছর পর্যন্ত পারফরম্যান্স থাকতে পারে, কিন্তু এরপর ক্যারিয়ার চালানো কঠিন। এরপর চাকরির সুযোগও কিন্তু কম। খেলাধুলায় যত দিন আছেন, তত দিন আয়। ক্রিকেটে তুলনামূলক আয় ভালো, ফুটবলে মোটামুটি, অন্যান্য খেলায় তা-ও নেই। কদিন আগে মিরপুর সুইমিং কমপ্লেক্সে ৩৪তম জাতীয় সাঁতারে প্রথমবারের মতো পদকজয়ীদের পুরস্কার দিয়েছে সাঁতার ফেডারেশন। সোনাজয়ী দুই হাজার, তৃতীয় হওয়ার জন্য মাত্র ৫০০ টাকা—ছেলে-মেয়ে সবাই। রেকর্ডধারীকে পাঁচ হাজার টাকা। ৪২ লাখ টাকার বাজেটে ব্রোঞ্জজয়ীর জন্য এই যুগে ৫০০ টাকাকে তামাশা ছাড়া আর কীই-বা বলা যেতে পারে!

ভারতে রেলওয়েসহ অনেক সংস্থা মেয়েদের চাকরি দিচ্ছে। শ্রীলঙ্কায় সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনী খেলোয়াড় কোটায় মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করছে। বাংলাদেশে সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, আনসারসহ কয়েকটি সংস্থা খেলোয়াড়দের চাকরি দেয়, কিন্তু ক্রিকেটে আনসার ছাড়া সেভাবে সুযোগ নেই। দেশে বিজেএমসিসহ অনেক দল বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় খেলার জায়গা কমেছে।

খেলোয়াড়দের জন্য বিকেএসপি খুব ভালো জায়গা। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজেকে দারুণভাবে মেলে ধরা ক্রিকেটার মারুফা আক্তারকে খুলনার ইমতিয়াজ হোসেন নামের একজন কোচ আবিষ্কার করেছেন, আর ওর বেড়ে ওঠায় বড় ভূমিকা রেখেছে বিকেএসপি। কিন্তু বিকেএসপি এ দেশে সীমিত। তাই স্কুল-কলেজে খেলাধুলার চর্চা বাড়াতে হবে।

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে বড় হয়ে নিজের উদ্যোগে স্কুলে ক্রিকেট টিম গড়ে খেলেছি, যার পরিণতিতে আজ এত দূর পর্যন্ত এসেছি। প্রজন্ম, সুযোগ ও মনোভাব বদলাবে—এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। মাঠে ঘাম, কষ্ট ও লড়াই দিয়ে প্রমাণ করেছি—যোগ্যতা ও সম্ভাবনা আমাদের আছে। চাই শুধু সমান সম্মান ও সুযোগ।

অনুলিখিত

এসএ গেমস | ১৩ এসএ গেমস (১৯৮৪-২০২৫) | ২২ সোনা ৩ গেমসে মেয়েদের | প্রথম মেয়েদের সোনা জয় ১৯৯১ **কাজী শাহানা পারভীন**

এসএ গেমসে ২৬ সোনা

- অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদদের সফলতার মানদণ্ড দক্ষিণ এশিয়ান (এসএ) গেমস, আগে যার নাম ছিল সাফ গেমস। ১৯৮৪ থেকে ২০২৫—এই ৪১ বছরে ১৩টি গেমসে ৮৭টি সোনা জিতেছে বাংলাদেশ। তার মধ্যে মেয়েদের হাত ধরে এসেছে ২৬টি—ব্যক্তিগত ১৭, দলীয় ৭ এবং মিশ্র ইভেন্টে ২টি। তবে এই সংখ্যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, ২৬ সোনার ২২টিই গত ১৫ বছরে হওয়া মাত্র তিনটি গেমস থেকে এসেছে। এতেই ফুটে ওঠে সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস, দেখিয়ে দেয় ক্রীড়াঙ্গনে তাদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা।
- ১৯৮৪, ১৯৮৫, ১৯৮৭, ১৯৮৯—টানা চারটি গেমসে শূন্য হাতে ফিরেছিল বাংলাদেশের মেয়েরা। অবশেষে ১৯৯১ সালে কলম্বোয় ইতিহাস গড়েন কাজী শাহানা পারভীন। শুটিংয়ের স্ট্যান্ডার্ড রাইফেলে জিতে নেন সোনা। ১৯৯৩ সালে ঢাকায় একই ইভেন্টে তাঁর সঙ্গে দলীয় সোনা জেতেন ফারজানা হোসেন ও সাবরিনা সুলতানা।
- ১৯৯৫ সালে মাদ্রাজ গেমসে মেয়েরা সোনাবিহীন থাকলেও ১৯৯৯ সালে শুটিংয়ের ৫০ মিটার স্মলবোর স্পোর্টস রাইফেল প্রোনে শাহানা-সাবরিনার সঙ্গে মিলে দলীয় সোনা আনেন লাভলী চৌধুরী। ২০০৪ সালে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে আলো কাড়েন শারমিন আক্তার। ২০০৬ সাল আবার সোনাশূন্য। কিন্তু ২০১০ সালে ১৮ সোনার ৮টিই জিতেছেন মেয়েরা—ব্যক্তিগত ছয়, দলীয় দুই। শুটিং, কারাতে, তায়কোয়ান্দো ও আর্চারিতে বেজেছে জাতীয় সংগীত।
- ২০১৬ সালে চার সোনার তিনটিই এসেছে মেয়েদের হাত ধরে। সাঁতারে জোড়া সোনা জেতেন মাহফুজা খাতুন আর ভারোত্তোলনে মাবিয়া আক্তার। আর ২০১৯ সালে ১৯টি সোনার ১১টিই মেয়েদের দান। ব্যক্তিগত ছয়, দলীয় তিন, মিশ্র দুই। কারাতে, ফেন্সিং, আর্চারি ও ভারোত্তোলনে এসেছে এসব সোনা।

ফ্রেশ
আল্ট্রা
স্ট্রং
সিমেন্ট
Fresh
ULTRA
STRONG
CEMENT
অধিক ক্লিংকারযুক্ত
মহাশক্তিশালী
সিমেন্ট

WHERE FRESHNESS BEGINS

নারীর প্রতি বৈষম্য রোধে এত আইন, তবু কেন বৈষম্য

তাসলিমা ইয়াসমীন
সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে শুধু নারীর প্রতি বৈষম্য রোধে একাধিক আইন রয়েছে। এতে মনে হতে পারে, বাংলাদেশের সার্বিক আইনকাঠামোতে বৈষম্যের শিকার নারীর জন্য যথেষ্ট সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের আইনকাঠামো অনেক ক্ষেত্রেই নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক। নারীকে উপেক্ষা করেই নারীর জন্য তৈরি হয়েছে একাধিক আইন ও নীতিমালা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের যথাযথ পর্যালোচনা না করেই একের পর এক আইন প্রণয়ন আর নারীর জন্য প্রণীত আইনে নারীর মতামতকেই অন্তর্ভুক্ত না করার ফল হলো আইনে নারীর বৈষম্যমূলক অবস্থান আর আইন প্রয়োগের দুর্বল কাঠামো।

বাংলাদেশে নারীর বৈষম্যমূলক অবস্থানের সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিকটি হলো নারীর প্রতি সহিংসতার ভয়াবহতা এবং সহিংসতা বন্ধে প্রচলিত আইনকাঠামোর ব্যর্থতা। খুব সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জাতীয় জরিপে দেখা গেছে, ৭৬ শতাংশ নারী জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে স্বামীর দ্বারা শারীরিক ও যৌন সহিংসতার শিকার হন। অথচ বাংলাদেশের আইনকাঠামোয় পারিবারিক নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবেই গণ্য করা হয় না। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মতো একটি সুনির্দিষ্ট আইনে যা কিনা পৃথক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার করার বিধান করেছে, পারিবারিক সহিংসতাকে অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এখনো শুধু যৌতুকসংক্রান্ত নির্যাতনের ক্ষেত্রেই স্বামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা সম্ভব, অন্য পারিবারিক সহিংসতা স্পষ্টতই ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের বাইরে।

আমাদের আইনকাঠামোয় নারী ও মেয়েশিশুর প্রতি সবচেয়ে বেশি বৈষম্যমূলক বিধানটি হলো কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে বৈবাহিক ধর্ষণকে বৈধতা দেওয়া। ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারা এখনো বলবৎ আছে। এখানে বলা আছে, ১৩ বছর বয়সী মেয়েশিশুও স্বামীর দ্বারা ধর্ষণের শিকার হলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না।

১৮৬০ সালের দণ্ডবিধিতে প্রথমে এই যৌনসম্মতির বয়সসীমা ছিল ১০ বছর, যা যেকোনো বিবাহিত বা অবিবাহিত শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। অর্থাৎ ১০ বছর বয়সের পরে কোনো বিবাহিত মেয়েশিশু তার স্বামীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করতে পারত না। কেননা ধরে নেওয়া হতো বিয়ের মাধ্যমে তার যৌন সম্পর্কে সম্মতি রয়েছে।

পরে ব্রিটিশ ভারতে একাধিক বর্বরোচিত ঘটনায় নববিবাহিত কন্যাশিশু প্রাপ্তবয়স্ক স্বামীর মাধ্যমে ধর্ষণের শিকার হয়ে মারা যায়। কিন্তু হত্যাকারী স্বামীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনা যায় না। সেসব ঘটনার সূত্র ধরে ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের আন্দোলনের মুখে বিবাহিত কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে দণ্ডবিধির ধর্ষণের ধারায় যৌন সম্পর্কে সম্মতির বয়সসীমা ১০ থেকে বাড়িয়ে প্রথমে ১২ ও পরে ১৩ করা হয়েছিল। চিকিৎসক সমাজসহ অনেক পক্ষই তখন দাবি তুলেছিল, এই বয়সসীমা আরও বাড়িয়ে ১৬ করা হোক। দুঃখজনক হলো, ১০০ বছর পরেও বিবাহিত মেয়েশিশুর জন্য সেই বয়সসীমা ১৩ বছরই রয়ে গেছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে যৌনসম্মতির বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬ বছর, কিন্তু এই বিধান আবার স্বামীর দ্বারা ধর্ষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সে ক্ষেত্রে দণ্ডবিধির ১৩ বছরের সীমাই প্রযোজ্য।

ক্ষতিগ্রস্তকেই শাস্তি

শিশুবিবাহ আইনেও বেশ কিছু বৈষম্যমূলক ধারা রয়েছে। ২০১৭ সালে নতুন করে প্রণীত এই আইনে বিবাহের শিকার শিশুর জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে, অথচ আইনটি নিজেই শিশুবিবাহের শিকার শিশুকে 'ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যে 'ক্ষতিগ্রস্ত' ব্যক্তির জন্য আইন করা হয়েছে, আইনে তাকেই শাস্তি প্রদান করার বিধান রাখা হয়েছে! এ ছাড়া এই আইনে নারী ও পুরুষের বিয়ের ক্ষেত্রে বৈধ বয়সসীমা যথাক্রমে ১৮ ও ২১ বছর করা হয়েছে। একজন নারী ১৮ বছর বয়সে বিয়ের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হলেও ১৮ বছরের একজন পুরুষকে কেন অপ্রাপ্তবয়স্ক মনে করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে কোনো আইনি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

নারীকে সামাজিক কুপ্রথা থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আরও রয়েছে যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮। এই আইনটি ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন বাতিল করে নতুনভাবে করা হয়। তবে এটি স্পষ্ট নয় যে কেন ১৯৮০ সালের আইনটিতে কিছু সংশোধন না করে নতুন আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন হলো। দুটি আইনের মধ্যে কিছু সংশোধন আর সংযোজন ছাড়া তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। বরং ১৯৮০ সালের আইনটিতে 'যৌতুক'-এর যে বৈষম্যমূলক সংজ্ঞার বিধান ছিল, তা আরও বেশি জটিল করে নতুন আইনে যৌতুককে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যৌতুকের আইনি সংজ্ঞায় কোনো আর্থিক দাবিদাওয়াকে যৌতুক হিসেবে প্রমাণ করতে গেলে একজন বাদীকে যেসব শর্ত পূরণ করতে হবে, তাতে যৌতুকের শিকার কেউ যদিবা প্রমাণও করতে পারেন যে তাঁর স্বামী প্রতিনিয়ত অর্থ বা সম্পত্তির দাবি করছেন, তবে দাবি করা সেই অর্থ বা সম্পদ যে এই আইন অনুযায়ী 'যৌতুক' হবে, সেটি প্রমাণ করা দুরূহ।

> পারিবারিক আইন থেকে শুরু করে সম্পত্তির অধিকারসংক্রান্ত আইন—সব ক্ষেত্রেই নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বিধান রয়েছে, যা সংবিধানের সমতানীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

শুধু তা-ই নয়, আইনে যৌতুক নেওয়ার শাস্তির মাত্রাও একই রাখা হয়েছে, অথচ যে যৌতুকপ্রথা বন্ধের উদ্দেশ্যে এই আইন করা হয়েছে, সেই প্রথার শিকার যে মূলত কনেপক্ষের পরিবার এবং পরবর্তী সময়ে বিবাহিত স্ত্রী, সেই বাস্তবতাকেই আইনে উপেক্ষা করা হয়েছে।

নারীর প্রতি বৈষম্যের আলোচনায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় ধর্মীয় পারিবারিক আইনগুলোতে বিদ্যমান নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বিধানগুলোর প্রচলিত ব্যাখ্যায়। পারিবারিক আইনে বৈষম্য নিয়ে কথা হয় অনেক, কিন্তু আইন সংস্কারের প্রশ্নে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে থাকে দৃশ্যমান নিষ্ক্রিয়তা। বিশ্বের অনেক দেশে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য প্রচলিত ধর্মীয় পারিবারিক আইনের কাঠামোয় ইতিবাচক পরিবর্তন আনা হয়েছে। সেই ইতিবাচক সংস্কারগুলো আমাদের পারিবারিক আইন পরিবর্তনের আলোচনায় অনেকটাই উপেক্ষিত রয়ে যায়। যেমন এখনো ১৮৯০ সালের গার্ডিয়ান অ্যান্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট দ্বারা নির্ধারণ করা হয় সন্তানের অভিভাবকত্ব। সেখানে স্পষ্টতই ধর্মীয় পারিবারিক আইনের অভিভাবকত্ব-সংক্রান্ত লিঙ্গবৈষম্যমূলক প্রচলিত ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যদিও বিগত দশকে আমাদের উচ্চ আদালত একাধিক সিদ্ধান্তে এটি স্পষ্ট করেছেন যে সন্তানের অভিভাবকত্ব নির্ধারণে শিশুর লৈঙ্গিক পরিচয় বা বয়স নয়, একমাত্র বিবেচ্য হবে তার সর্বোত্তম স্বার্থ। শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষা করা বাংলাদেশের অনুস্বাক্ষরকৃত জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের মূল নীতির সঙ্গেও সংগতিপূর্ণ। একাধিক মামলায় আমাদের উচ্চ আদালতও তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। সন্তানের অভিভাবকত্ব নির্ধারণে তাই প্রয়োজন নতুন আইন, যেখানে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধানতম বিবেচ্য হিসেবে আইনে স্পষ্ট করা থাকবে।

আরও কিছু বৈষম্যমূলক আইন

পারিবারিক আইনের বেশ কটি বৈষম্যমূলক বিষয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত হলো হিন্দু নারীর বিবাহবিচ্ছেদ করার অধিকার। ২০২৫ সালে এসেও একজন হিন্দু নারী তাঁর স্বামীর সঙ্গে বৈধভাবে বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারেন না। অন্যদিকে হিন্দু পুরুষের যেহেতু প্রচলিত সনাতনী রীতিতে বহুবিবাহ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই, তাই বিবাহবিচ্ছেদ না করার মতো প্রাচীন প্রথার প্রয়োগে একজন হিন্দু পুরুষের ভোগান্তি হয় না, বরং মারাত্মক বৈষম্যের শিকার হন একজন হিন্দু নারী।

বহুবিবাহ আর তালাকের ক্ষেত্রে মুসলিম নারীও অনেক ক্ষেত্রেই বৈষম্যমূলক আইন প্রয়োগের শিকার হন। আদালতে পারিবারিক আইনের বেশির ভাগ বিষয়ই যেহেতু ধর্মীয় রীতিনীতির প্রচলিত ব্যাখ্যা দিয়েই নির্ধারিত হয়, ধর্মীয় সংবেদনশীলতার প্রশ্নটি তাই অনেক সময় পারিবারিক আইনের সংস্কারের ক্ষেত্রে বাধা বলে মনে করা হয়। নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে আইন সংস্কার করতে হলে ধর্মীয় নীতির সংবেদনশীলতাকে বিবেচনায় রেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আলোকে রাষ্ট্রকে সার্বিকভাবে আইন পরিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। পারিবারিক আইনের বৈষম্য দূর না করে নারীর সম-অধিকার আদায়ের কোনো আইন সংস্কারই যথার্থ হবে না।

নারীর প্রতি সহিংসতাসংক্রান্ত আইন এবং পারিবারিক আইনের বাইরেও আমাদের প্রচলিত আইনকাঠামোর অনেক জায়গাতেই সরাসরি নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বিধান রয়েছে, যা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা খুবই সীমিত। যেমন বাংলাদেশের শ্রম আইনের ৮৭ ধারায় একজন কিশোর শ্রমিক অর্থাৎ ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুশ্রমিকের জন্য প্রযোজ্য বিপজ্জনক কাজের যে বাধানিষেধ আছে, তা একজন নারী শ্রমিকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ একজন নারী শ্রমিকের কর্মক্ষমতা যাচাই-বাছাই না করেই, তাঁর সম্মতি থাকুক বা না থাকুক, তাঁর কাজের সুযোগ সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ব্রিটিশ আমলের অনেকগুলো আইন বাংলাদেশে প্রযোজ্য। ১০০ বছর আগের এই আইনগুলোতে একজন 'বিবাহিত নারী'কে কিছু ক্ষেত্রে সীমিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা সরাসরি আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী একজন বিবাহিত নারী যথাযথ ট্রাস্টি হতে পারবেন না।

এভাবে পারিবারিক আইন থেকে শুরু করে শ্রম আইন, ফৌজদারি আইন থেকে শুরু করে সম্পত্তির অধিকারসংক্রান্ত আইন—প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর প্রতি একাধিক বৈষম্যমূলক বিধান রয়েছে, যা সংবিধানের সমতার নীতি ও আন্তর্জাতিক আইনে দায়বদ্ধতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে অন্তর্ভুক্ত না করে আইনকাঠামোতে নারীর অবস্থানের উত্তরণ ঘটানো সম্ভব নয়।

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় আইনের মূল অংশীদারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে অর্থাৎ যাদের ওপর আইনটির যথাযথ প্রয়োগ নির্ভর করে, তা প্রণয়ন ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে কী পরিবর্তন হওয়া উচিত, সেই পর্যালোচনায় তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক, পাবলিক প্রসিকিউটর থেকে শুরু করে বিচারপ্রার্থী নারীর মতামতকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। কোনো আইন প্রণয়ন করার পাশাপাশি আইনটি প্রয়োগের জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা এবং আইন প্রয়োগের পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যালোচনা করার সরকারি উদ্যোগকেও একই সঙ্গে কার্যকর করতে হবে। নয়তো নতুন আইন শুধুই কাগজে-কলমে রয়ে যাবে, ন্যায়বিচার যাদের প্রয়োজন, তারা আইনের সুরক্ষার বাইরেই থেকে যাবে।

আইন থাকা সত্ত্বেও বাল্যবিবাহের কারণে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে অনেক কন্যাশিশু। ছবি : প্রথম আলো

CONCORD

SOME OF OUR STUNNING NEW PROJECTS
AT PRIME LOCATIONS IN DHAKA

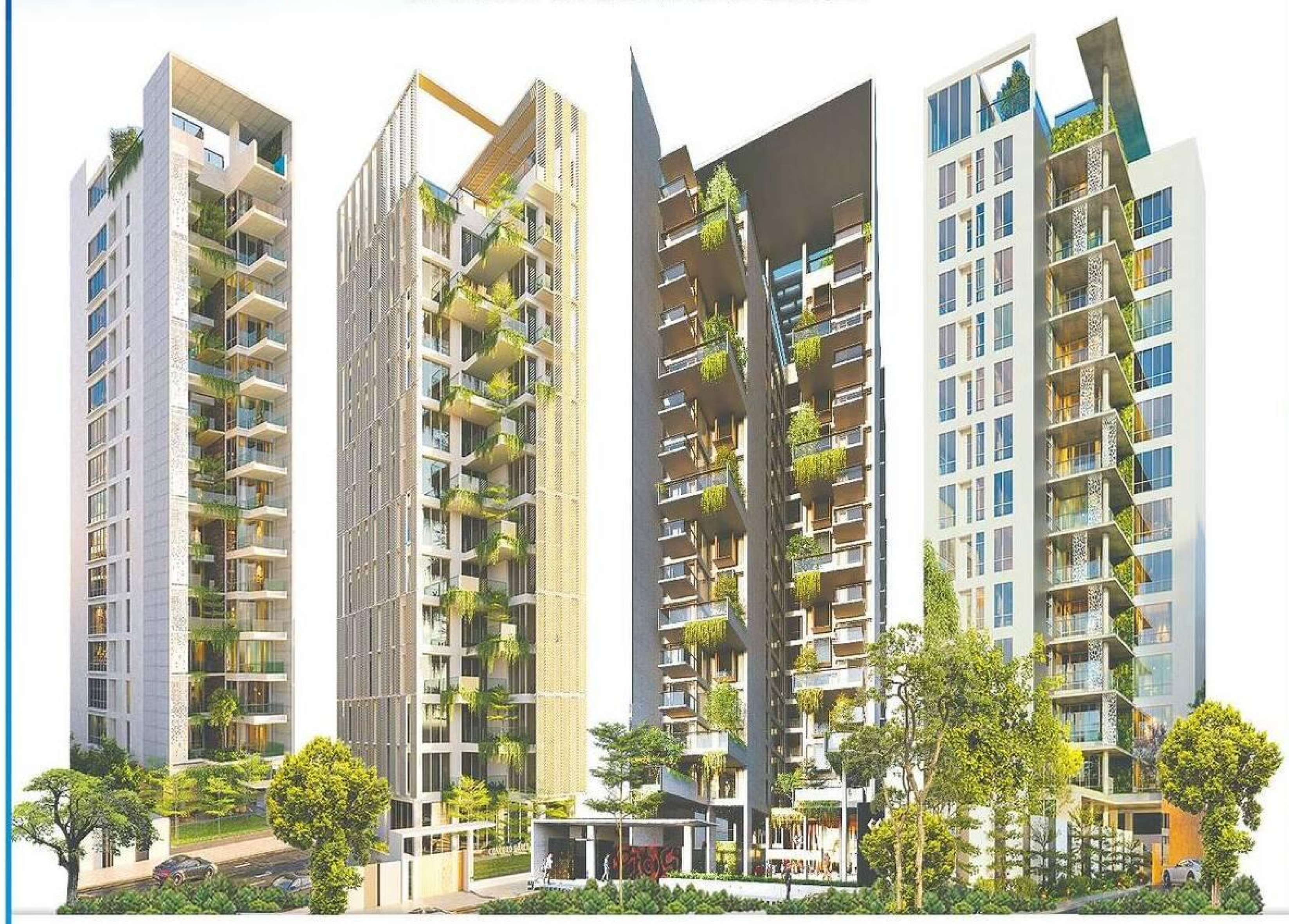

CONCORD REAL ESTATE & DEVELOPMENT LTD.

CONCORD READY-MIX & CONCRETE PRODUCTS LTD.

CONCORD ENTERTAINMENT CO. LTD.

প্রথম আলো-এর
২৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে
আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন

CONCORD

বিশ্বমানের মেশিনারিজ, ২৪/৭ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও হাসপাতাল
সেবা নিয়ে আমরা আছি আপনাদের পাশে ...

হাসপাতাল সেবা

২৪/৭
- জরুরী বিভাগ
- বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
- ডায়াগনস্টিক
- অপারেশন
- ব্লাড ব্যাংক
- আইসিইউ (ICU)
- ডায়ালাইসিস
- ফার্মেসি
- এ্যাম্বুলেন্স

বিশ্ববিখ্যাত
SIEMENS Healthineers (Germany)
3.0 T MRI

মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার সেবা

২৪/৭
- জরুরী বিভাগ
- গাইনি ও শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
- নরমাল ডেলিভারী
- ব্যথামুক্ত নরমাল ডেলিভারী
- এনআইসিইউ (NICU)
- অপারেশন
- হাসপাতাল

শীঘ্রই আসছে

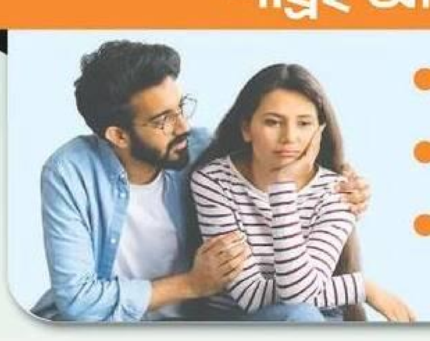

- আইভিএফ (IVF)
- পিআইসিইউ (PICU)
- আই কেয়ার সেন্টার

অন্যান্য সেবা
- আইইউআই (IUI)
- ফিজিওথেরাপি এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন
- ইইসিপি (EECP)
- ডেন্টাল কেয়ার

২৪/৭ নরমাল ডেলিভারী বিশেষজ্ঞ টিম

ডায়াগনস্টিক সেবা

- 3.0 T MRI
- 128 Slice CT SCAN
- 4D আল্ট্রাসনোগ্রাম
- মেমোগ্রাম • ইআরসিপি (ERCP)
- ভিডিও এন্ডোস্কপি ও কোলনোস্কপি
- ভিটামিন D3 • ব্রঙ্কোস্কোপি
- স্পাইরোমেট্রি / ইউরোফ্লোমেট্রি
- ডিজিটাল ওপিজি ও সিভিসিটি
- এ্যালার্জি প্যানেল টেস্ট ইত্যাদি

* ডেঙ্গু চিকিৎসায় শতভাগ সফল
* গরীব ও দুঃস্থদের জন্য কমমূল্যে/বিনামূল্যে চিকিৎসা

সুস্থ জীবন, সুন্দর পৃথিবী

Aalok Healthcare & Hospital
Aalok Health TV

আলোক হাসপাতাল লি.
বাড়ি-১ , রোড-৫, ব্লক-এ, মিরপুর-৬

২৪/৭ বিস্তারিত জানতে:
10672
09610100999

আলোক হেলথকেয়ার লি.
বাড়ি-১ ও ৩, রোড-২, ব্লক-বি, মিরপুর-১০

আলোক
মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার
বাড়ি-৩, রোড-৪. ব্লক -এ, মিরপুর-৬, ঢাকা।

প্রাথমিক শিক্ষায় বৈষম্য আমাদের ভবিষ্যৎকেই ঝুঁকিতে ফেলবে

রাশেদা কে চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক,
গণসাক্ষরতা অভিযান

প্রাথমিক শিক্ষা শুধু একটি স্তর নয়, এটি সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি। এই ভিত্তি যত মজবুত হবে, তার ওপর দাঁড়িয়ে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা তত বেশি শক্তিশালী হবে। পরিণতিতে যা আমাদের ভবিষ্যৎ জাতি গঠনে সহায়ক হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, আমাদের এই ভিত্তিই এখন নড়বড়ে। প্রাথমিক শিক্ষায় ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, শিক্ষক-সংকট, ঝরে পড়া, নানা ধরনের বিদ্যালয়ের মধ্যে মানের পার্থক্য—সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে গভীর এক সংকট। এর প্রভাব কেবল শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান, দক্ষতা ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নেও পড়ছে।

আমরা এখনো প্রাথমিক শিক্ষায় সমতাভিত্তিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারিনি। করোনার ধাক্কায় একসময় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে গিয়েছিল, এখন কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু সরকারি বিদ্যালয় একটিও বাড়েনি, বেড়েছে কেবল বেসরকারিভাবে পরিচালিত নানা ধরনের বিদ্যালয়। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় বহুমুখী সংকট এবং বেসরকারি শিক্ষার অনভিপ্রেত বিস্তার—এই দ্বৈত বাস্তবতা আমাদের শিক্ষাবৈষম্যকে আরও গভীর করে তুলেছে। যেসব পরিবার সচ্ছল, তারা শিশুদের শহরে-বন্দরে বেসরকারি ভালো বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছে। কিন্তু দরিদ্র, প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার শিশুরা সরকারি বিদ্যালয়ে সীমিত সুযোগ-সুবিধা নিয়েই পড়াশোনা করছে।

শিক্ষার্থীর সংখ্যায়ও একধরনের ওঠানামা দেখা গেছে। ২০২০ সালে প্রাথমিকে শিক্ষার্থী ছিল ২ কোটি ১৫ লাখ। ২০২৩ সালে তা নেমে আসে ২ কোটির নিচে, ২০২৪ সালে কিছুটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ১ লাখ ৮৩ হাজারে। এই সামান্য বৃদ্ধিও কোনো আশাবাদী বার্তা দেয় না। কারণ, গুণগত মান ও ধারাবাহিকতা প্রশ্নবিদ্ধ থেকেই যাচ্ছে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, ঝরে পড়ার হার। ২০২০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কমলেও ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ দশমিক ২৫ শতাংশে (সূত্র : বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি)। ছেলেদের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি—১৯ শতাংশের কাছাকাছি; অর্থাৎ প্রতি পাঁচজন ছেলের একজন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারছে না। ময়মনসিংহ, রংপুর ও সিলেট বিভাগে ঝরে পড়ার হার সবচেয়ে বেশি; বিশেষ করে নেত্রকোনায়, সেখানে এই হার ৪৪ শতাংশ! এটি কোনো সংখ্যার খেলা নয়—এটি হাজারো শিশুর এগিয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হওয়ার গল্প।

শিশুদের কেন ধরে রাখা যাচ্ছে না?

আমাদের অবশ্যই প্রশ্ন করতে হবে, কেন শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা যাচ্ছে না? প্রথমত, শিক্ষকের সংকট ভয়াবহ। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনো ৩৪ হাজারের বেশি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য; সাড়ে ২৪ হাজার সহকারী শিক্ষকের পদও খালি। অনেক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষককেই ৪০-৫০ জন শিক্ষার্থীর দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। শিক্ষক যদি ক্লান্ত, অপ্রস্তুত ও অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে শিশুদের শেখার আগ্রহও ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও পরিবেশে বৈষম্য। শহরের বিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভালো ভবন ও সুযোগ-সুবিধা থাকলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়ে এখনো বিদ্যুৎ, টয়লেট কিংবা নিরাপদ পানির ব্যবস্থায় ঘাটতি আছে। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য এসব মৌলিক সুবিধার অভাব প্রাথমিক পর্যায়েই ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ। সঙ্গে দারিদ্র্য তো আছেই।

তৃতীয়ত, শিক্ষা প্রশাসনে ধারাবাহিকতা ও সমন্বয়ের ঘাটতি। এক সরকার এক নীতি নেয়, পরের সরকার এসে তা পরিবর্তন করে। স্থানীয় সরকার, শিক্ষা অধিদপ্তর, নারী ও শিশুবিষয়ক অধিদপ্তর, এনজিও ও উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। ফলে শিক্ষানীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

সম্প্রতি বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা হঠাৎ আবার চালু করা হয়েছে! শিক্ষা-বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, এই সিদ্ধান্ত লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি করবে। কারণ, এটি প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যমান বৈষম্যকে আরও বাড়াবে। ২০০৯ সালের আগে পৃথকভাবে বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়া হতো, যেখানে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরাই অংশ নিতে পারত। ২০০৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষা চালু হলে সব শিক্ষার্থীই বৃত্তির প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারত। যদিও পিইসি নিয়েও সমালোচনা ছিল। এতে অল্প বয়স থেকেই অসুস্থ প্রতিযোগিতা, কোচিং-প্রাইভেটনির্ভরতা—এমনকি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাও ঘটেছিল।

কোভিড-পরবর্তী সময়ে নতুন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধ হয় পিইসি পরীক্ষা। কিন্তু ২০২২ সালের শেষ দিকে আকস্মিকভাবে আবার বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রণালয়। বিশেষজ্ঞদের আপত্তি সত্ত্বেও তা অনুষ্ঠিত হয়, পরে ফল প্রকাশেও দেখা দেয় নানা ভুলভ্রান্তি। ২০২৩ সালে আবারও বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত হয়নি। এখন আবার সেই পুরোনো পথে ফেরার প্রয়োজন কেন হলো, বোধগম্য নয়! প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার কোনো যৌক্তিকতা নেই। অতীতে এ-সংক্রান্ত গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তেও এসব পরীক্ষার মাধ্যমে নেতিবাচক প্রবণতা দেখা গেছে। নির্দিষ্টসংখ্যক শিক্ষার্থীকে বেছে বৃত্তি দেওয়ার এই পদ্ধতি কোটানির্ভরতা ও বৈষম্য আরও বাড়াবে। যে কোটা পদ্ধতি নির্মূলের জন্য চব্বিশের জুলাই আন্দোলনে আমাদের সন্তানেরা এত ত্যাগ স্বীকার করল, শিক্ষার ভিত্তিমূল প্রাথমিক পর্যায়ে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীকে বাছাই করে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা চালু করে আমরা সেই কোটা পদ্ধতিই চালু করছি কেন? তাহলে কি কোচিং ও গাইড ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে না?

প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণের কথা বহুদিন ধরেই বলা হচ্ছে, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। এখন অন্তত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা যেতে পারে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুযায়ী ধীরে ধীরে তা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাড়ানো প্রয়োজন।

> প্রাথমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষকেরা কত গ্রেডে বেতন পান? বেতন স্কেলের গ্রেড ১৩; অর্থাৎ একজন কম্পিউটার অপারেটরের স্কেলে...। এই হচ্ছে তাঁর সম্মান।

এই তাঁর সম্মান

আমরা এখনো শিক্ষকদের পর্যাপ্ত বেতন-ভাতা দিতে পারছি না। প্রায়ই দেখি, শিক্ষকেরা ন্যায্য বেতন ও মর্যাদার দাবিতে আন্দোলন করেন, আইন-আদালতের আশ্রয় নেন। যাঁরা জাতির ভবিষ্যৎ গড়েন, তাঁদের সুবিধা দিতে কেন পিছুটান থাকবে?

গত অক্টোবরে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' উপলক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় বলেছিলেন, 'সরকারি শিক্ষকদের মধ্যে আমরা দেখব, সবচেয়ে নিচে রয়েছেন আমাদের প্রাথমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষকেরা। তাঁরা কত গ্রেডে বেতন পান? (জাতীয় বেতন স্কেলের গ্রেড) ১৩; অর্থাৎ একজন কম্পিউটার অপারেটরের স্কেলে...। এই হচ্ছে তাঁর সম্মান। উপজেলা হেডকোয়ার্টারে যেখানে তিনি বেতন পান, সেই হিসাবরক্ষক, তাঁর স্কেল হচ্ছে ১২তম। তাঁকে স্যার ডাকার মতো অবস্থাও দেখা যায়।' শিক্ষকদের প্রকৃত মর্যাদা দিতে হলে শুধু মুখের কথায় নয়, বাস্তবে পদক্ষেপ নিতে হবে—এ কথাও তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন।

আমরা দেখি, নীতিনির্ধারকেরা প্রায়ই শিক্ষা নিয়ে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেন, সুন্দর সুন্দর কথা বলেন, কিন্তু বাস্তব পদক্ষেপে ঘাটতি থাকে। শিক্ষা যেন অগ্রাধিকারের তালিকা থেকে ছিটকে পড়েছে। ইদানীং এটি আরও বেশি হচ্ছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতে সংস্কারের জন্য ১১টি কমিশন গঠন করেছে, কিন্তু শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো কমিশন গঠন করেনি, যা সময়ের দাবি ছিল। আগে যেমন খণ্ডিতভাবে ও বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার নানা রকম কাজ হতো, এখনো যেন সেই ধারাই চলছে। আরও উদ্বেগের বিষয়, চলতি অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ টাকার অঙ্কে কমে গেছে। অথচ আমরা চাই, এখন বাজেটে শিক্ষা খাতে কমপক্ষে ১৫ শতাংশ বরাদ্দ রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কীভাবে তা ২০ শতাংশে উন্নীত করা যায়, তার পথরেখা প্রণয়ন করা।

প্রাথমিক শিক্ষার এ অবস্থার পরিবর্তনে এখনই কিছু বাস্তবসম্মত ও নীতিগত পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমত, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রধান শিক্ষক পদ দীর্ঘদিন শূন্য থাকা শিক্ষার মানকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করছে। দ্রুত নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে, প্রশিক্ষণকে আধুনিক ও শিশুকেন্দ্রিক করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয় পর্যায়ে বৈষম্য হ্রাস করতে হবে। দারিদ্র্যপীড়িত ও দুর্গম অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে বাড়তি প্রণোদনা, উপবৃত্তি, পুষ্টিকর খাদ্য ও শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। ঝরে পড়া শিশুদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি সম্প্রসারিত করতে হবে। প্রাথমিকে শিক্ষার্থীপ্রতি উপবৃত্তি মাসে কমপক্ষে ৫০০ টাকা এবং মিড ডে মিল সর্বজনীন করা উচিত। বাংলাদেশে শিশু অপুষ্টির উদ্বেগজনক হার হ্রাস করার ক্ষেত্রে এর কোনো বিকল্প নেই।

তৃতীয়ত, শিক্ষা বিষয়ে ধারাবাহিকতা রাখা ও স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় সরকার ও গোষ্ঠীভিত্তিক (কমিউনিটি বেজড) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়া উচিত।

চতুর্থত, শিক্ষার গুণগত মানের ওপর জোর দিতে হবে। শেখার ফলাফল, পাঠ্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ অর্জন—এসবকে মূল্যায়নের মানদণ্ডে আনতে হবে।

পঞ্চমত, প্রযুক্তি ও ডিজিটাল সহায়তা গ্রামীণ বিদ্যালয়েও পৌঁছে দিতে হবে, যাতে শহর-গ্রামের শেখার ফারাক কমে আসে।

সবশেষে বলব, প্রাথমিক শিক্ষা একটি জাতির ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ। আজ যে শিশুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে, কাল সে আমাদের দক্ষ জনশক্তির ঘাটতি হয়ে ফিরে আসবে। প্রাথমিক শিক্ষায় বৈষম্য মানে সমাজে বৈষম্যের পুনরুৎপাদন। তাই এখনই যদি আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে সমতার ভিত্তিতে, মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ ও মানসম্মত করে গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে শিক্ষার উন্নয়ন কেবল কথার কথা হয়েই থাকবে, বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন সুদূর পরাহত থেকে যাবে।

প্রাথমিক শিক্ষা একটি জাতির ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ, যা আমাদের ভবিষ্যৎ জাতি গঠনে সহায়ক। ছবি : প্রথম আলো

ক্রোড়পত্র সম্পাদক : সুমনা শারমীন; সহযোগিতায় : জামিল বিন সিদ্দিক, সজীব মিয়া; অঙ্গসজ্জা : আনিসুজ্জামান সোহেল, গ্রাফিকস : আমিনুল ইসলাম